Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিসরাত জাহান

রোলঃ 23100120060

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নিসরাত জাহান

রোলঃ 23100120060

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নিসরাত জাহান, আইডিঃ 23100120060 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি পরিবার গঠনে স্বামী-স্ত্রী দায়িত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Nisrat

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

নিসরাত জাহান

আইডিঃ 23100120060

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

অধ্যায়-১:পরিবার 8

ভূমিকা 8

ইসলামি পরিবার কি? 9

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম 10

পরিবার কেনো প্রয়োজন? 13

পরিবার না থাকার ক্ষতি 13

পরিবার ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ 16

ঘরে ইবাদতের পরিবেশ 18

হারাম থেকে বেঁচে থাকা 20

পারিবারিক কথোপকথন যেমন হবে 21

পশ্চিমা পরিবার বনাম ইসলামিক পরিবার 28

মিডিয়া ও সমাজের প্রভাব 29

পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য 31

পারিবারিক জীবনের সুফল- 34

কুরআন ও হাদিসে পরিবারের গুরুত্ব 36

অধ্যায়-২:বিয়ের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য 40

বিয়ের ফজিলত 40

বিয়ের মূল উদ্দেশ্য 43

উত্তম ও নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা 45

অভিভাবকের অনুমতি 50

পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ও সাক্ষাত 50

কফু'র দিকে লক্ষ্য রাখা 52

সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিয়ে 52

মোহর প্রদান.....53
আদর্শ দাম্পত্য জীবন যেমন হবে.....54
দাম্পত্য জীবনে বারাকাহ লাভের উপায়.....57
অধ্যায়-৩: স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য.....66
স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব.....66
উত্তম কথা ও উত্তম ব্যবহার.....66
স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা.....67
স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হওয়া.....68
বাড়িতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেওয়া.....68
স্ত্রী অসুস্থ হলে সেবা করা.....69
স্ত্রীকে সহযোগিতা করা.....69
স্ত্রীর ভরনপোষণ ও চাহিদা পূরণ.....70
স্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া ও পরামর্শ করা.....72
স্ত্রীকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া.....72
স্ত্রীকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান.....73
অধ্যায়-৪: স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য.....74
স্বামীর আনুগত্য.....74
ধৈর্যশীল হওয়া.....75
অন্যের সামনে নিজেকে প্রদর্শন না করা.....75
লজ্জাস্থানের হেফাজত করা.....77
স্বামীর রাগের সময় স্ত্রী বিনম্র হওয়া.....78
স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেয়া.....78
স্বামীকে সম্মান করা ও তার অনুগত থাকা.....79
অধ্যায়-৫:স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক.....80

পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা.....80
সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা.....80
সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে দৃঢ়তা.....83
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল.....86
ভালোবাসার সাথে সমালোচনার মিশেল.....89
আলাপচারিতা.....91
একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা.....92
সফল পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা.....93
সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ না করা.....94
একটি ভালো পরিবেশের গুরুত্ব.....95
পারস্পরিক সহযোগিতা.....98
অধ্যায়-৬:সন্তান প্রতিপালন.....100
ইসলামি ও নৈতিকতার শিক্ষা.....100
যেসব বিষয়ে শিশুরা সক্রিয়.....101
শিক্ষার ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থা.....102
সন্তানদের যেভাবে গড়ব.....104
মনের যত কথা.....108
উৎসাহ প্রদান.....109
কাজের প্রতিফলন.....112
শিশুদের আঘাত না করা.....113
অধ্যায়-৭:পারিবারিক সমস্যা ও সমাধান.....114
ঝগড়া-বিবাদ সমাধান.....114
ভুল বোঝাবুঝি দূর করা.....115
ধৈর্য ও ক্ষমার গুরুত্ব.....116

তালাকের বিষয় (সংক্ষিপ্ত আলোচনা) 117
অধ্যায় ৮: আদর্শ মুসলিম পরিবার 121
নবীজির (ﷺ) পারিবারিক জীবন 121
সাহাবীদের পরিবার 123
বর্তমান যুগের শিক্ষা 126

অধ্যায়-১:পরিবার

ভূমিকা

পরিবার সমাজের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের বহু শারঈ বিধানের লালন ক্ষেত্র হচ্ছে পারিবারিক জীবন। প্রকৃত ইসলামী পরিবার গঠনের ওপরেই মূলত নির্ভর করে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কামিয়াবীর সিংহভাগ। পারিবারিক জীবনের সূচনা হয় বিয়ে-শাদীর মাধ্যমে, একজন নারী ও একজন পুরুষ যখন তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করে। সাধারণত একটি বর্ধিত পরিবারের একটি শাখা বা প্রশাখা হিসেবে এর উৎপত্তি ঘটলেও সময়ের ব্যবধানে এবং পর্যায়ক্রমে এ দাম্পত্য জীবন একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভ করে নিজেই মূল হিসেবে আবির্ভূত হয়ে আবার শাখা প্রশাখা সৃষ্টি করে। হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে মানব সন্তানের বিকাশ ও বিস্তৃতির এটাই হচ্ছে চিরন্তন প্রাকৃতিক উপায়। পরিবারের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবনকে যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গঠন করা যায় তাহলে সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে বিস্তৃত ও বর্ধিত পরিবারকেও ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা সহজ হবে। অন্যদিকে যদি দাম্পত্য জীবনে গলদ ঢুকে যায় এবং ইসলামী আদর্শের ঘাটতি হয়ে যায় তাহলে পরিবারের ইসলামীকরণ অবশ্যই দুরূহ হয়ে পড়বে। তাই আদর্শ পরিবার গঠনের প্রাথমিক ও অন্যতম প্রধান কাজটি বিবাহ-শাদির আগেই পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় করতে হবে। স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বীনদারের বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ার জন্য হাদিসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সৌন্দর্য, বংশ বা সামাজিক মর্যাদা অথবা সম্পদ এসব মানুষের কাছে আপাতত দৃষ্টিতে আকর্ষণীয় মনে হলেও দ্বীনদারি বাদ দিয়ে শুধু এগুলোর ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিলে আদর্শ পরিবার গঠনের প্রধান উপাদানেই ভেজাল ঢুকে যাবে।পাত্রী নির্বাচনের সময় শুধু স্ত্রীই নয় বরং একই সাথে সন্তানের মা-ও নির্বাচন করা হচ্ছে,এই বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।একইভাবে পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রেও দ্বীনদারীতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ একটি পরিবার সন্তান-সন্ততি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের প্রচেষ্টায় আদর্শ ও সুন্দর হতে পারে।কিন্ত অত্যন্ত চিন্তার বিষয় হচ্ছে, আজকাল আমাদের সমাজে উচ্চ ডিগ্রি ও বৈষয়িক অবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।ইসলামি জ্ঞান, আমল-আখলাকের বিষয়ে তেমন

গুরুত্ব দেওয়া হয়না।অথচ পিতা-মাতা দ্বীনদার না হলে সন্তানদের সঠিক ইসলামি শিক্ষা দানের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব নয়।তাই আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

মানব সমাজের মূল ভিত্তি হলো পরিবার। যা স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে শুরু হয়ে থাকে। আদম ও হাওয়া (আ:)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম মানব পরিবার গড়ে উঠে।সারাদিনের কর্মক্লান্তি ও বিভিন্ন কারনে মানুষের মনে দুঃখ-বেদনা পাওয়ার পরে সবাই যেখানে শান্তির খোঁজ করে সেটা হলো পরিবার। যদি পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকে তাহলে মানুষের জীবন সুখময় হয়ে উঠে।কিন্ত অন্যদিকে পরিবারে যদি কাঙ্ক্ষিত শান্তি না থাকে তাহলে মানুষের জীবন হয়ে উঠে বিষাদময়। এজন্য একটি আর্দশ পরিবারের গুরুত্ব অনেক। তাই শান্তি-সুখের ঠিকানা আদর্শ গঠনের করণীয় সম্পর্কে এ বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে।সেই সাথে পরিবারের পরিচয়,পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা,পরিবার না থাকার ক্ষতিকর দিকসমূহ,পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য, বিয়ের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য, সন্তান প্রতিপালন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং দাওয়াতের অছিলা হিসেবে কবুল করুন-আমিন।

ইসলামি পরিবার কি?

স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও দাদা-দাদি নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। পরিবারের সংজ্ঞায় Oxford ইংরেজি অভিধানে বলা হয়েছে- A group consisting of one or two parents and their children.অর্থাৎ পরিবার হলো পিতা বা মাতা অথবা পিতা-মাতা উভয় ও তাদের সন্তান-সন্ততির সমষ্টি। {Oxford advance learners English dictionary, (New Yeork:Oxford University press,8th edn, 2010),p-551}

সমাজ বিজ্ঞানী এম.এফ নিফকফ বলেন, পরিবার হচ্ছে মোটামুটিভাবে স্থায়ী এমন একটি সংস্থা বা সংঘ,যেখানে সন্তানাদিসহ বা সন্তানবিহীনভাবে স্বামী-স্ত্রী একত্রে বসবাস করে।{ M.F Nimkof, Marriage and the Family (Boston:1947),p-6.}

Encyclopedia Americana-তে পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে- The term Family usually refers to a Group of persons related birth or marriage (ordinarily parents and their children) Who reside in the same household. অর্থাৎ 'পরিবার' শব্দটি সাধারণত জন্ম বা বিবাহ সম্পর্কিত ব্যক্তিদের (সাধারণত বাবা-মা ও তাদের সন্তানদের)বোঝায়,যারা একই পরিবারে বাস করে।{ Encyclopedia Americana, vol-ii,(U.S.A:Grolier Incorporate, 1980),p-2.}

পরিবারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল-ফিকহুল মানহাজী গ্রন্থে বলা হয়েছে- ইসলামের দৃষ্টিতে পারিভাষিক অর্থে পরিবার বলতে বুঝায় পিতা-মাতা,দাদা-দাদি,ছেলে-মেয়ে ও পৌত্র-পৌত্রীদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে।{ আল ফিকহুল মানহাজী আলা মাযাহাবিল ইমাম আশ-শাফিঈ, ৪র্থ খন্ড, (দিমাশক:দারুল কলম,৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৩হি:/১৯৯২খ্রি:),পৃ:৯}

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম

ইসলাম থেকেই আমরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাই। ঠিক এ কারণেই একটি মুসলিম পরিবার সর্বদা ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলার ব্যাপারে সচেতন থাকে। ইসলামের বিধিনিষেধগুলোতে পরিবারের মানুষগুলোকে অভ্যস্ত করে তুলতে নিরন্তর অধ্যবসায়ের প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে, ইসলাম থেকেই আমরা আদর্শ ও আচার-আচরণের মৌলিক ও সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাই। আন্তঃসম্পর্ক, লেনদেনসহ সকল সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানের উৎস হলো ইসলাম। পবিত্র কুরআনের এই মহিমান্বিত

আয়াত থেকে বোঝা যায়, আমরা আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানের সন্ধান ইসলাম থেকেই পেয়ে থাকি।

“(হে নবী) আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি তাতেই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।”{সুরা আনআম:১৬২-১৬৩}

আল্লাহ তাআলা আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর বান্দা হিসেবে আমরা তাঁকে ভালোবাসব। তিনি সন্তুষ্ট হবেন এমন কর্মকাণ্ডে সদা নিয়োজিত থাকব। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নবীর সুন্নাত অনুসরণ করা উচিত। তাঁর সুন্নাত পালনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ পায়। ইসলামি বিষয়ে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জন জরুরি। অন্যদের জন্য হিদায়াত কামনা করা ইসলামের ভালোবাসার লক্ষণ। তদুপরি আল্লাহর পথে আহ্বান করতে অবশ্যই ইসলামের বাণী ও ইসলামি মতবাদ প্রচার করে যেতে হবে।
জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। ইসলাম প্রচার ও প্রসারে যেকেউ নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে। তবে তার আগে ইসলামের বিধিবিধান ও মতবাদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। ঠিক এই কারণেই আমাদের উচিত ইসলামের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা। যেমন: আকিদা, সিরাত, ফিকহ এবং তাফসির ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে হবে। মুসলিম জাতির বিশিষ্ট আলিমদের রচনাবলী সংগ্রহ করে তা নিয়ে গবেষণা করা উচিত। অন্যভাবে বলা যায়, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রামাণিক প্রতিবেদন (হাদিস) নিয়ে কাজ করতে হবে।
উপকারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সকলের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে। গুরুত্বের ভিত্তিতে যেকোনো বিষয় নিয়ে ইসলাম আলোচনা করার অনুমতি দেয়। তবে আমাদের উচিত কেবল বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলিমকে দ্বীনি প্রশ্ন করা। এমন অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অনেকসময় এই মতভেদ সৃষ্টিশীল হয় এবং মতভিন্নতা দ্বীন পালনে প্রশস্ততা তৈরি করে।

ইসলাম ও মুসলিম-সম্পর্কিত যেকোনো বিষয়ে আমাদের আগ্রহ থাকা চাই। অপর মুসলিমের প্রয়োজনে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের নিয়ম (তাজবীদ) মেনে সুরা মুখস্থ করলে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে। যথেষ্ট সময় ধরে কুরআনের বাণীগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমাদের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে।

আমাদের উচিত মহান আল্লাহর পথে কুরবানি করা। জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের সবার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। একমাত্র আখিরাতের সাফল্য অর্জনের জন্য কাজ করার লক্ষ্যেই আমরা এই জীবন পেয়েছি। পরম করুণাময় আল্লাহর অসীম রহমতে জান্নাতের অনন্ত সুখ লাভ করতে হলে আমাদেরকে কঠোর সাধনা আর অধ্যবসায় চালিয়ে যেতে হবে।

ত্যাগের প্রস্তুতির পাশাপাশি সর্বদা সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। প্রিয় নবির শিক্ষা ও সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে অন্তরে ধারণ করার চেষ্টা থাকতে হবে। এ ছাড়া আমাদের সন্তানদের নানাবিধ প্রশ্ন করে আল্লাহ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানানো উচিত। এমন প্রশ্ন করতে হবে, যা তাদের হৃদয়ে আল্লাহর উপস্থিতিকে জীবন্ত করে তুলতে পারে। এ ধরনের আলোচনার চলাকালীন অথবা অন্য কোনো সময় তাদের মনে জাগ্রত হওয়া নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারা পৃথিবীর অত্যাচারিত মুসলিমদের সার্বিক পরিস্থিতি, তাদের নৈতিকনৈতিক নানা বিষয় এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা যেতে পারে। আশপাশের দুর্দশাগ্রস্ত পরিবারগুলোকে সাহায্য করা উচিত। আমাদের উদার এবং বিনীত আচরণই পারে তাদের অধিকাংশ পারিবারিক সমস্যার সমাধান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে। ইসলামের মহান ও বিনয়ী নীতিমালা এবং শিক্ষা কাজে লাগিয়ে তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে।

পরিবার কেনো প্রয়োজন?

পরিবার মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। মানুষ জন্মের পর প্রথম যে পরিবেশে বড় হয়, তা হলো পরিবার। এখান থেকেই সে ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সহানুভূতি এবং নৈতিকতা শেখে। একটি সুস্থ ও আদর্শ পরিবার একজন মানুষকে সৎ, দায়িত্বশীল ও মানবিক করে গড়ে তোলে।

পরিবারের প্রধান প্রয়োজনীয়তার একটি হলো মানসিক নিরাপত্তা। জীবনের দুঃখ-কষ্ট, ব্যর্থতা বা সংকটে মানুষ পরিবারের কাছ থেকেই সান্ত্বনা ও সাহস পায়। পরিবার পাশে থাকলে কঠিন পরিস্থিতিও সহজ মনে হয়। আবার সুখের সময়ও পরিবারের সাথে ভাগ করে নেওয়াই প্রকৃত আনন্দ দেয়।

শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রেও পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুরা প্রথমে পরিবার থেকেই শৃঙ্খলা, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখে। বাবা-মা ও বড়দের আচরণ দেখে তারা নিজেদের জীবন গড়ে তোলে। তাই একটি ভালো পরিবার সমাজের জন্য ভালো নাগরিক তৈরি করে।

এছাড়া পরিবার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহায়তার কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে। অসুস্থতা, আর্থিক সমস্যা বা যেকোনো বিপদে পরিবার একে অপরকে সাহায্য করে। এতে পারস্পরিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয় এবং সমাজে স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

সবশেষে বলা যায়, পরিবার ছাড়া মানুষের জীবন অসম্পূর্ণ। এটি শুধু বসবাসের জায়গা নয়, বরং ভালোবাসা, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও মূল্যবোধের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য সুস্থ ও শক্তিশালী পরিবার অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিবার না থাকার ক্ষতি

পরিবার মানুষের জন্য যেমন নিরাপদ আশ্রয়স্থল, তেমনি মানসিক প্রশান্তি লাভের স্থান।এজন্য মানবজীবনে

পরিবারের গুরুত্ব অনেক। কিন্ত পরিবার না থাকলে মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়।নিচে কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হলো-

১/ নিরাপত্তাহীন হওয়া: দুনিয়াবি জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন বিপদাপদ, অসুখ-বিসুখ,দুঃখ-কষ্ট ইত্যাদির শিকার হয়ে মানুষ অনেক সময় দিশাহারা হয়ে যায়।এ সময় পরিবারের অন্যান্য সদস্য তার সাহায্যে এগিয়ে আসে।অসুখে সেবা করে,বিপদে সাহায্য করে,দুঃখ-কষ্টে সান্ত্বনা দেয়।কিন্ত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষের জন্য এসব পাওয়ার উপায় থাকেনা।ফলে সে হয়ে পড়ে উদ্ভ্রান্ত। তার জীবনের নিরাপত্তা থাকেনা।

২/ সহযোগিতা না পাওয়া: অর্থ মানুষের জীবনের এক আবশ্যিক বিষয়।রক্ত ছাড়া যেমন মানুষ বাঁচে না,তেমনি অর্থ ছাড়া জীবন চলেনা।তাই বিভিন্ন সময়ে মানুষের অর্থের প্রয়োজন হয়।পরিবারের লোকেরাই সেই প্রয়োজন পূরনে এগিয়ে আসে।জীবনের সব ক্ষেত্রে মানুষ কর্মক্ষম থাকেনা।মানুষ জীবনের সূচনাকালে যেমন সে অক্ষম ও পরনির্ভরশীল থাকে,ঠিক তেমনই জীবনের শেষ বেলায় সে আবার অক্ষম ও পরনির্ভরশীল হয়ে যায়।

৩/ নৈতিক অবক্ষয়: বর্তমানে পরিবারকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।ঘরে ঘরে জ্বলছে অশান্তির আগুন।পরিবারের অশান্তির প্রভাব পড়ছে সমাজে।যেমন-ইন্টারনেট, মোবাইল ইত্যাদির মাধ্যমে পর্ণছবি প্রদর্শন, ব্লাকমেইল, ইভটিজিং মহামারির মতো বৃদ্ধি পাচ্ছে।অশালীন পোশাক, রূপ চর্চা,ফ্যাশন, অবাধ মেলামেশা,মাদক, পরকীয়া, প্রেমালাপ, অবৈধ যৌনাচারে সয়লাব চলছে সমাজের সর্বত্র। এ সকল কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে পরিবারের সাথে বাক-বিতন্ডা,মনোমালিন্য,চুরি,ছিনতাই ইত্যাদি কিছুই বাদ যাচ্ছেনা।এর নেতিবাচক পরিণতি পরিণতি হিসাবে পারিবারিক সহিংসতার বিস্তার ঘটছে।এ ধরনের সামাজিক অস্থিরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পুরো সমাজকে এক চরম ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

বর্তমানে যে সকল পরিবার সন্তানদের প্রতি উদাসীন, সন্তানদের প্রতি সঠিক দায়িত্ব পালন করেন না, তাদের অধিকাংশের যুবক-তরুণ সন্তান-সন্ততি উচ্ছৃঙ্খল ও অনৈতিক জীবন যাপন করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমাজে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করে

থাকে। এদের মাঝে ধর্মীয় অনুশীলন, ইসলামী মূল্যবোধ, ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা, পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ নেই বললেই চলে। ধনী শ্রেণী বৈধ-অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করে এবং ভোগ-বিলাসেই মত্ত থাকে অধিকাংশ সময়। সন্তান-সন্ততি চাইলেই তারা টাকা-পয়সা দিয়ে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ, দামী মোবাইল, গাড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েই দায়মুক্ত হয়। অথচ সন্তানের কোন ভুল-ত্রুটি অভিভাবকের চোখে ধরা পড়ে না। বর্তমান সময়ের অভিভাবকগণ এসব ব্যাপারে আগের মত সিরিয়াস নন, তারা কেবল অর্থের পিছনে ছুটছেন। সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

৪/বন্ধনহীন হওয়া: পরিবারে আত্মীয়তার মধুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে কতগুলি মানুষ। যারা একে অপরের সহযোগী ও সহমর্মী, পরস্পরের বিপদে এগিয়ে আসে। কিন্তু পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ এসব সুযোগ-সুবিধা পায় না।
উল্লেখ্য যে, দেশ-কাল, সমাজ, পারিপার্শ্বিকতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, দায়িত্ব-কর্তব্য ও রীতিনীতির কারণে পরিবারের রূপ ভিন্ন হয়। কালের পরিক্রমায় পরিবর্তিত হচ্ছে পরিবারের কাঠামো ও এর পরিধি বা আকার-আয়তন।যৌথ পরিবার ভেঙে গঠিত হচ্ছে একক পরিবার। দেখা দিচ্ছে এক ধরনের বন্ধনহীনতা।যা কোনো জ্ঞানী মানুষের কাম্য নয়।

৫/উদ্দেশ্যহীন জীবন: পরিবার মানুষকে একটি স্থানে ও একটি লক্ষ্যে চলতে সাহায্য করে।কখনও সে লক্ষ্যচ্যুত হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে সঠিক পথে চলতে ও নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ফিরে আনতে তৎপর হয়।কিন্ত পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকেনা।সে যা ইচ্ছা তাই করে,যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যায়।পারিবারিক বন্ধনহীন এই জীবন যেন হাল বিহীন নৌকার মতো। সুতারাং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া কোন বিবেকবান মানুষের জন্য সমীচীন নয়।

পরিবার ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ

মানুষ তথা ব্যক্তি, পরিবার ও সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। আল্লাহ তাআলা এভাবেই মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কিছু কিছু সমস্যা থাকে খুবই স্বাভাবিক, যা প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়। আবার কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয় অন্যের প্রতি অবিচার ও সীমালঙ্ঘন করার কারণে। বাস্তবিক সমস্যাগুলো ঘটে ব্যক্তিগত ভুল, অক্ষমতা এবং অবহেলার কারণে।

নিচের আয়াতগুলো নিয়ে গভীর পর্যালোচনা করলেই এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়—
“যখন তোমাদের ওপর একটি মুসিবত এসে পৌঁছাল, অথচ তোমরা এর পূর্বেই (তাদেরকে) দ্বিগুণ কষ্ট দিয়েছ, আর এখন তোমরা বলছ—আমাদের ওপর এ মুসিবত কীভাবে এলো? হে রাসূল আপনি বলে দিন, এ কষ্ট তোমাদের ওপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ের ওপর ক্ষমতাশীল।” [সুরা আল-ইমরান:১৬৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—
“আর যদি মুসিবতের সময় তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।”[সুরা আল-ইমরান:১২০]

একটি মুসলিম পরিবারের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান বের করতে এই ধারণাটিকে খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে।

এবার একটি পরিবারের চমকপ্রদ গল্প শোনা যাক—
একবার বাড়ির আসবাবপত্র পরিবর্তন করা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বাগবিতণ্ডার সৃষ্টি হলো। স্বামীর ইচ্ছা, শুধু পুরোনো ও ব্যবহারের অযোগ্য ফার্নিচারগুলো সরিয়ে দেবেন। কিন্তু স্ত্রী চাচ্ছিলেন ভালো-খারাপ সব ফার্নিচার সরিয়ে একদম নতুন ফার্নিচার দিয়ে ঘর সাজাতে। এই সামান্য বিষয় থেকে তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়ার

সূত্র হলো। শেষমেশ তারা সিদ্ধান্ত নিল, তাদের পক্ষে আর একসাথে ঘর করা সম্ভব নয়।

ঘটনার ঠিক পরদিন তাদের সদ্য-সাবালক-পাশ-করা ছেলেটি মায়ের সাথে এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলল। গতদিন তাদের মধ্যে কী কী ঘটেছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মা বললেন, 'তোর বাবা প্রথমে বাড়ির সব ফার্নিচার সরাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তোর দাদির কানপড়া শুনে তিনি মত পাল্টে ফেলেছেন।' এরপর ছেলেটি তার বাবার কাছে গেল। বাবা তাকে বললেন, 'এক সপ্তাহ আগে আমরা দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমরা শুধু পুরোনো ফার্নিচারগুলো বদলাব। কিন্তু তোর আম্মুর বান্ধবীদের কথায় প্রভাবিত হয়ে ঘটনাটি কোন দিকে মোড় নিয়েছে, তা তো তুই দেখতেই পাচ্ছিস।'

সন্ধ্যায় ছেলেটি বাবা-মা দুজনকে নিয়ে বসল এবং তাদের মীমাংসার জন্য আলোচনা করতে লাগল। ছেলেটি বলল, 'বাড়ির আসবাব পরিবর্তনের বিষয়ে বাবার ওপর দাদির চাপ প্রয়োগ কিংবা বান্ধবীদের কথায় মায়ের বোকা থাকার অভিযোগ নিতান্তই ছেলেমানুষি। আসল সমস্যা হলো তোমাদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব আছে। আর তোমরা মোটেও এ বিষয়টি নিয়ে সিরিয়াস নও। এই কারণে কোনো তৃতীয় পক্ষ জড়িত হওয়া ছাড়াই তোমরা নিজেরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছ। বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয় না, ফার্নিচার এমন কোনো বড় বিষয়, যে কারণে বিচ্ছেদের পর্যায়ে চলে যেতে হবে। আমার মনে হয়, আমরা মাস ছয়েকের জন্য ফার্নিচার পাল্টানোর কাজটা বন্ধ রাখি। এই সময়টায় আমরা বরং হারানো ভালোবাসা, সুসম্পর্ক ও বোঝাপড়া পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। আমাদের উচিত নিজেদের বন্ধন আরো বেশি মজবুত করা।'

বাবা-মা দুজনই হাসিমুখে ছেলের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন। ছেলের এমন যুক্তিসংগত ও অভিনব মতামতে মা খুব খুশি হলেন। বাবাও তার বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপের প্রশংসা করলেন।

ঘরে ইবাদতের পরিবেশ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন—"আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মূসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাসস্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো কিবলামুখী করে বানাও এবং নামাজ কায়েম কর। আর যারা ঈমানদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।"[সুরা ইউনূস:৮৭]

ইমাম তাবারী রহ. বর্ণনা করেন—ইবনে আব্বাস রাদি. বলেন, তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন তাদের ঘরগুলোকে মসজিদে পরিণত করে।"[তাফসীরে তাবারী:১৫/১৭২,হা.নং ১৭৭৯৪(প্র.মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন—আর সম্ভবত এটা তখনকার কথা—আল্লাহ-ই ভালো জানেন—যখন ফেরাউন ও তার কওমের পক্ষ থেকে নির্যাতনের পরিমাণ বেড়ে গেল এবং এরা তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলল, তখন তাদেরকে বেশি বেশি নামাজ আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেমনি ভাবে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।' [সুরা বাকারা: ১৫৩] সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় হুযাইফা রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে কোনো সমস্যা দেখা দিত, তখন তিনি নামাজ আদায় করতেন।"[তাফসীরে ইবনে কাসীর:৪/২৫২(প্র.দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা,বৈরূত)]

এর মাধ্যমেই ঘরে নামাজ আদায়ের গুরুত্ব বুঝা যায়। বিশেষভাবে দুর্বলতার সময় এবং যখন পরিস্থিতি এমন তৈরি হয়ে যায় যে, মুসলমানগণ কাফেরদের সামনে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে পারে না, তখন ঘরে নামাজ আদায় করতে হবে। আমরা এখানে মারইয়াম আ. এর মেহরাবের কথাও আলোচনা করব, যেটা ছিল তার ইবাদতের স্থান।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন—
“যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কাছে আসতেন, তখনই তার সামনে খাবার দেখতে পেতেন।”[সুরা আল-ইমরান:৩৭]

সাহাবায়ে কেরাম রা. ফরজ নামাজ ব্যতীত অন্যান্য নামাজ ঘরে আদায় করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এ ব্যাপারে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

মাহমুদ বিন রবি আনসারী রহ. বলেন, “বদরী সাহাবী আতবান বিন মালেক রাদি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আসলেন এবং তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমি চোখে কম দেখি এবং আমি আমার কওমের সাথে নামাজ আদায় করি। কিন্তু যখন বৃষ্টি আসে এবং আমার ও তাদের মধ্যে অবস্থিত উপত্যকা প্লাবিত হয়, তখন আমি তাদের মসজিদে এসে তাদের সাথে নামাজ আদায় করতে পারি না। হে আল্লাহর রাসূল, তাই আমি আশা করি, আপনি আমার বাড়িতে আসবেন এবং আমার ঘরে নামাজ আদায় করবেন। তাহলে আমি সেই জায়গাকে নামাজের স্থান বানাব।তখন রাসূল (সা:) তাকে বললেন, ইনশাআল্লাহ, আমি অচিরেই এটা করব।আতবান রাযি.বলেন,পরদিন সকালে যখন সূর্য একটু ওপরে উঠল,তখন রাসূল (সা:) ও আবু বকর রাযি.আসলেন।রাসূল (সা:) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশের আগে কোথাও বসলেন না।অতঃপর তিনি বললেন, আমি তোমার ঘরের কোন জায়গায় নামাজ আদায় করলে তুমি খুশি হবে?তিনি বলেন,আমি আমার ঘরের এক কোণের দিকে ইশারা করলাম। তখন রাসূল (সা:) সেখানে দাড়ালেন এবং তাকবীর দিলেন।অতঃপর আমরাও তার পেছনে কাতার করে দাড়ালাম এবং তিনি দুই রাকাত নামাজ আদায় করে সালাম ফিরালেন। [সহীহ বুখারী:১/৯২,হা.নং ৪২৫(প্র.দারু তাওকিন নাজাত,বৈরূত)]

হারাম থেকে বেঁচে থাকা

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ইসলামের প্রতিটি বিধিবিধানই উপকারী।ইসলামি আইনগুলো উপযুক্ত ও ন্যায্য। অবশ্যই ইসলামের রীতিনীতিগুলো অতি সাধারণ ও সরল। ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক বস্তু ছাড়া, কোনো কিছুকেই নিষিদ্ধ করা হয়নি।

উদাহরণস্বরূপ-মিথ্যা বলা, বেইমানি করা, গিবত করা, মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, অবৈধ প্রেমালাপ, কেলেঙ্কারি, সুদি কারবার, শুকরের মাংস খাওয়া, জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা, মদ্যপান ও ধূমপানকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারণ উল্লিখিত প্রতিটি কাজ কোনো-না-কোনোভাবে আমাদের স্বাস্থ্য বা রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। বৃহত্তর অর্থে এ কাজগুলো সমাজে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। শরিয়ত-নির্দেশিত নিষিদ্ধ বিষয়গুলো শুধু সমস্যা ও বিপদ ডেকে আনে। কিছু কাজের তাৎক্ষণিক প্রভাব দৃশ্যমান। কিছু কাজ দ্রুত ফলাফল বয়ে আনে। আর বাকি কাজগুলোর ধারাবাহিক ফল দেখতে পাই। এই কারণে কোনো পরিবার সম্পূর্ণভাবে ইসলামি শিক্ষার প্রতি অনুগত থাকলে, ইসলামের পথে পরিচালিত হলে এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মেনে চললে তা সর্বদাই প্রশংসাযোগ্য হয়।

মুসলিম পরিবারগুলো জলদি ঘুমাতে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতেন। রাতের খাওয়া শেষে প্রায় দুঘণ্টা পরে ঘুমাতে যাওয়ার একটি নিয়ম তৈরি করে নিলে খুব ভালো ফল পাওয়া যাবে। খেয়াল রাখতে হবে, বাড়ির ছোট সদস্যদের বাড়ির কাজ, পড়াশোনা, অ্যাসাইনমেন্ট যেন অবশ্যই ঈশার সালাতের আগে শেষ হয়। ঈশার সালাত আদায় করে, রাতের খাবার খেয়ে নিতে হবে। খাওয়াদাওয়ার পর পরিবারের সবাই একত্রিত হয়ে কিছু সময় আড্ডা দেওয়া যেতে পারে। এতে করে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়াটা মজবুত হয়ে ওঠে। এরপরই নিতে হবে ঘুমাতে যাওয়ার প্রস্তুতি। জলদি ঘুমাতে যাওয়ার কারণে তাহাজ্জুদের জন্য জেগে ওঠা সহজ হবে। পরিবারের সবাই সালাত আদায় করতে ওঠে, সৃষ্টিকর্তার সামনে নিজেদের সমর্পণ করে, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চায়, কুরআন তিলাওয়াত করে। তাড়াতাড়ি ঘুমোনোর কারণে পরিবারে স্বতন্ত্রতা বিরাজ করে। পাশাপাশি গবেষণায় পাওয়া গিয়েছে-তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া শরীরের জন্য

খুবই উপকারী। এর ব্যাবহারিক প্রমাণও রয়েছে।সুতরাং আল্লাহর কাছে ওয়াদাবদ্ধ ধার্মিক পরিবার অন্যদের তুলনায় স্বাস্থ্যকর জীবনের পাশাপাশি ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতির নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে একটি উপভোগ্য জীবন যাপন করে।

পারিবারিক কথোপকথন যেমন হবে

১/ আপনি যদি আলাপের প্রধান হয়ে থাকেন, তাহলে কিছু শর্তসাপেক্ষে সন্তানের উদ্দেশ্যে শুরুটা এভাবে করতে পারেন, 'যদিও তুমি পরিবারের সবচেয়ে ছোট সদস্য, তবু আলাপ চলাকালীন বিভিন্ন বিষয়কে যথাযথভাবে পরিচালনা করার জন্য তোমার থাকা প্রয়োজন। কারণ, পরবর্তী আলোচনাটিকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হবে। আর এজন্য বাকিদের সহযোগিতাও একান্তভাবে কাম্য। আর তোমার পরিচালনার ধরন নিয়ে কারো যদি কোনো মন্তব্য থাকে, তবে আলোচনা শেষে তা বলার সুযোগ থাকবে।'

২/ শুরুতেই আলাপচারিতার সময়টা নির্ধারণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ কথোপকথন কতক্ষণ স্থায়ী হবে তা সবাইকে বলে দিলে খুব ভালো হয়। বিশেষ করে আলোচনায় যদি ১০ বছরের ছোট কোনো বাচ্চা থাকে, তবে আলাপ ৩০ মিনিটের বেশি করা কোনোভাবেই ঠিক হবে না। এক আলাপে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা অনুচিত। এগুলো নিয়ন্ত্রণে থাকলে কোনো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে না এবং কোনো সমঝোতায় পৌঁছানোর পর ব্যর্থতা অপর আলাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা।কোন বিষয়ে আলোচনা হবে, সে ব্যাপারে পরিবারের সবাইকে পুরোপুরি একমত থাকা চাই। পরিচালককে খেয়াল রাখতে হবে কেউ যেন এদিক-সেদিকের কথাবার্তা বলে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে না দেয়। যেমন ধরুন, পরিবারের কেউ হয়তো গণিতে ফেইল করেছে। এর কারণ জানতে এবং কীভাবে তাকে সহায়তা করা যায়, সে বিষয়ে আলাপ করতে বসল পরিবারটি। তখন হঠাৎ বড়ভাই স্কুলের ব্যবস্থাপনা আর পড়ানোর ধরন নিয়ে সমালোচনা শুরু করে দিলো। এই একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা পুরো আলোচনাটিকে ভন্ডুল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। একটু চিন্তা করলে দেখতে পাব, আমাদের ৪০% কথাবার্তাই মূল বিষয়বস্তুর সাথে কোনো সম্পর্ক

রাখে না। তাই নির্ধারিত সময়ের ভেতর সর্বোচ্চ সেরাটুকু নিশ্চিত করার দায়িত্ব পরিচালককেই নিতে হবে।

৩/ একটি কথোপকথনকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে এর গুরুত্ব আর উপকারিতা পরিবারের সবাইকে বোঝাতে হবে। তবে এই কাজটি বেশ কঠিন আর চ্যালেঞ্জিং। পারিবারিক আলোচনা কেন প্রয়োজন তা যদি কেউ না বোঝে, তবে আলোচনায় বসা কিংবা এর বিষয়বস্তুকে মোটেই সে আমলে নেবে না। কেউ কেউ হয়তো আলাপের শুরুতেই এই বলে বসে, 'আমি এখন উঠি তাহলে। তোমরা সবাই যে বিষয়ে একমত হবে, সেটা আমাকে জানিয়ে দিয়ো। আমিও তা-ই মেনে নেব।' সে আসলে ভাবছে কথোপকথনে যাওয়াটা অর্থহীন এবং শেষমেশ কোনো ফলাফলে পৌঁছাতে পারবে না। এক্ষেত্রে সেই সদস্যকে আলোচনার একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। প্রত্যেকের মাঝে যখন এই অনুভূতিটি কাজ করবে যে, 'পারিবারিক আলোচনার আমিও একজন অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমার মতামতকে সবাই গুরুত্ব দেবে', তখন সে আলোচনার প্রতি মনোযোগী হবে এবং যেকোনো সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসবে। তাই আমাদের উচিত প্রতিটি সদস্যের মতামতকে আমলে নেওয়া এবং ভালো ভালো প্রস্তাবগুলোর প্রশংসা করা।

৪/ প্রায় সময় দেখা যায়, আলোচনা চলাকালীন টুকিটাকি কথাবার্তা থেকে দুজন মানুষের মধ্যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যাচ্ছে। আর এসব ক্ষেত্রে পরিবারের বাকি সদস্যেরা চুপচাপ তা শুনতে থাকে এবং দীর্ঘ কলহ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে। সাধারণত একজন আরেকজনের মতামতকে কটাক্ষ করলে কিংবা তাকে কোনোভাবে আঘাত করে কথা বললে এমনটা ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে পরিচালকের দায়িত হচ্ছে এ ধরনের ঘটনাকে যথাসম্ভব সামলানোর চেষ্টা করা। এখানে বেশ উপকারী কিছু প্রস্তাবনা উল্লেখ করা হলো- বনিবনা হয় না, এমন দুই ব্যক্তিকে সামনাসামনি কিংবা পাশাপাশি বসানো যাবে না। এতে করে তারা ঝগড়ার প্রতি বেশি মনোযোগ দেবে এবং নিজেদের মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। কথা-কাটাকাটি বা ঝগড়াবিবাদ শুরু হলে তাদের দুজনকে চুপ থাকতে বলা হবে। এরপর পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা সময়-সুযোগ বুঝে তাদের মনোমালিন্যের সমাধান করে দেবেন। আরেকটা কাজ করা যেতে পারে, প্রতিপক্ষের কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে সবাই

পরিচালকের দিকে মনোনিবেশ করবে। এতে কিছু সময় পর তারা এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে। আলাপ শেষে পরিবারের দুজন সদস্যের মতের অমিল হওয়াটা খুব স্বাভাবিক একটা বিষয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। একজন দক্ষ পরিচালকই এটা রোধ করতে পারেন। তবে যদি পরিচালক নিজেই এমন পরিস্থিতির শিকার হন এবং সমাধান করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে তার উচিত বাবা-মায়ের শরণাপন্ন হওয়া। আলোচনায় কখনো উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় করা যাবে না এবং গলার স্বর যেন কারো উঁচু না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। কেউ যদি কাউকে বাক্যবাণে জর্জরিত করার চেষ্টা করে, তবে সে যেন তার কথা ফিরিয়ে নেয় এবং ক্ষমা চায়। এই বিষয়গুলো পরিচালককেই নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে আলাপ চালিয়ে যাওয়াটা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। অনেক সময় বাচ্চারা ঠাট্টার ছলে একে অন্যকে নানারকম দোষারোপ করে থাকে। যদিও তারা নিতান্তই মজার ছলে এসব কথা বলে, তবু মাঝে মাঝে তা অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতে রূপ নেয় এবং মনে ভীষণ আঘাত হানে। যেমন: একটি মেয়েকে তার ভাইবোনেরা 'রগচটা হিংসুটে' বলে খ্যাপায়। একদিন পারিবারিক আলাপ চলাকালে তার ছোট ভাই তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলল, 'কতই না ভালো হতো যদি পরিবারে কোনো রগচটা হিংসুটে না থাকত!

এখানে লক্ষ করতে হবে ছোট ভাইয়ের মন্তব্য শুনে মেয়েটি কোনো রিএ্যাক্ট করছে কি না। যদি সে এতে কষ্ট পায়, তাহলে পরিচালকের উচিত তার ভাইকে এই কথাটি বলার জন্য ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা। আলাপটিকে অমার্জিত অবস্থা থেকে একটি সম্মানিত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সচেষ্ট থাকতে হবে। আলোচনাটির গুরুত্ব আরো বাড়িয়ে দিতে পরিচালক বাকি সদস্যদের অহেতুক বাক্যালাপ এবং অপ্রাসঙ্গিক কথা বলা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাবে।

৫/ কথোপকথনে নিজস্ব মতামত ও অভিব্যক্তিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারাটা একটি বিশাল ব্যাপার। শিশুরা মাঝে মাঝে এমন কিছু অভিব্যক্তি প্রকাশ করে, যার ভাবার্থ ও তাৎপর্য পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় না। এমনকি কিছু প্রাপ্তবয়স্ক মানুষও এমনটা করে থাকেন। এই কারণে পরিচালকের দায়িত্ব সকলকে এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, প্রত্যেককে খুব স্পষ্টভাবে তাদের মতামত জানাতে হবে। নিশ্চিত হতে হবে, সে যা বলছে সেটাই সে প্রকাশ করতে চাচ্ছে এবং সেটাই প্রকাশ করছে যা সে

বলছে। যেমন ধরুন, পরিবারের কেউ বলল, 'আমাদের বাচ্চার স্কুলে বেশকিছু সমস্যা আছে। আর তারা ছোট বাচ্চাদেরকে শেখানোর ব্যাপারে অতটা আন্তরিক নন। এজন্য বলছিলাম কী, আমাদের বাচ্চাকে অন্য কোনো স্কুলে ভর্তি করালে কেমন হয়? এক্ষেত্রে পরিচালকের দায়িত্ব হচ্ছে নির্দিষ্টভাবে কোন কোন জায়গাগুলোতে সমস্যা রয়েছে তা জানতে চাওয়া। সে কি অন্যান্য স্কুলের সাথে তুলনা করে এ কথা বলছে? নাকি তাদের কর্মদক্ষতা নির্ণয়ের নিজস্ব কোনো মাপকাঠি রয়েছে তার কাছে? ওখানকার শিক্ষকরা ছোট বাচ্চাদেরকে কিছু শেখাতে পারছে না বলতে কী বোঝাতে চাইছে? আর স্কুলসম্পর্কিত এসব মন্তব্যের পেছনে কী যুক্তি রয়েছে তাও জানতে চাইবে। আরেকটি উদাহরণ খেয়াল করি। ধরা যাক, রফিক নামের কোনো ছেলে দিনের বড় একটা অংশ বাসার বাইরে থাকে এবং প্রায়ই খুব রাত করে বাড়ি ফেরে। এর সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে তা জানার জন্য পরিবারের সদস্যরা আলাপে বসেছেন। তখন তার বড় ভাই বলে উঠল, 'তার এই স্বভাবের জন্য আমাদের এক আত্মীয় দায়ী। সে রফিককে সবসময় বখাটে ছেলেদের সাথে চলাফেরা করতে বলে। আর রফিক যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে সে খুব শীঘ্রই নানারকম খারাপ কাজে জড়িয়ে যায় ।

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের কোন আত্মীয়ের কথা বলছ?' এর জবাবে বড় ভাইটি বলল, 'আমি তার নাম বলতে পারব না, এতে করে সে আমার ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু সে আমাদেরই এক আত্মীয়।' এক্ষেত্রে বড় ছেলেটিকে আশ্বস্ত করতে হবে, এখানকার কোনো কথাই বাইরে যাবে না এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য তার নাম জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সময় দেখা যায়, কেউ হয়তো অভিযোগের সুরে বলছে, 'আমি চাই না আমার ভাই পাশের বাসার ছেলেটার সাথে খেলতে যাক।' এর কারণ হিসেবে সে কোনোমতে জানায়, 'পাশের বাসার ছেলেটা ভীষণ অহংকারী, খুব দুষ্টু।' কিংবা 'সে কারো কথা শোনে না, অভদ্র একটা ছেলে।' কিন্তু পরে জানা গেল, ছেলেটি আসলে খুবই ভালো। প্রথমে যা বলা হয়েছিল সব মিথ্যা। আমাদের কথাবার্তায় দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যার দ্বারা আমরা অনেক কিছু প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু ভাষা কখনো পরিপূর্ণ নয়। এর সাথে ব্যবহারকারীদের ভুলভ্রান্তি যোগ করলে বোঝা যায়, ভাষার ব্যবহারে ভুল করাটাই স্বাভাবিক। উপযুক্ত ব্যাখ্যা সংযোজনের মাধ্যমে কথার অস্পষ্টতা ও ভুল বোঝাবুঝি এড়ানো সম্ভব।

৬/ যারা অন্যের ব্যাপারে গিবত করেন, অপবাদ দেন, তাদেরকে বিনয়ের সাথে বোঝাতে হবে, এটা খুবই জঘন্য একটি কাজ। আমাদের আলাপচারিতাগুলোয় সচরাচর যে জিনিসটা বেশি লক্ষ করা যায় তা হলো, প্রমাণ ছাড়াই আরেকজনের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া। সবটা না জেনেই অন্যকে অপবাদ দিয়ে বসি। প্রায়ই মানুষের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে থাকি। আর এভাবেই আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার নির্দেশকে অমান্য করি- হে ঈমানদারগণ, তোমরা বহুবিধ ধারণা ও অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ কোনো কোনো ধারণা ও অনুমান গুনাহ।[সুরা হুজুরাত: ১২]

হে ঈমানদারগণ, যদি কোনো পাপাচারী তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা অনুসন্ধান করে দেখো। এমন যেন না হয়, না জেনেই তোমরা কোনো গোষ্ঠীর ক্ষতি করে বসবে এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।[সুরা হুজুরাত:৬]

একটি পরিস্থিতি কল্পনা করুন যেখানে একটি ছেলে বলছে, 'আমি আমার বন্ধুর কলম চুরি করিনি। আমি এটা ভুল করে আমার ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছি।' তখন তার বড়ভাই তাকে অপবাদ দিয়ে বলতে থাকল, 'তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি ইচ্ছে করেই এটা চুরি করেছ।' ছেলেটি আত্মপক্ষ সমর্থন করে একই কথা বারবার বলতে থাকল। আর বড়ভাইটিও তাকে দোষ দিতে লাগল। এমন পরিস্থিতিতে আলোচনার পরিচালক বড়ভাইকে বাধা দেবে যেন সে ছোট ভাইকে আর অপদস্থ না করে। যতক্ষণ না তার দোষ প্রমাণিত হচ্ছে তাকে নির্দোষ ও নিরপরাধ বলেই মেনে নিতে হবে। আর যখন পরিবারের কোনো একজন সদস্য বলবে আমি এটা বোঝাতে চাইনি অথবা আমি এটা ভেবে বলিনি বা আমি এই কাজটি ইচ্ছে করে করিনি, তখন তাকে বিশ্বাস করতে হবে। আর তার বিরুদ্ধে কোনো অপবাদ দেওয়া যাবে না।
কাউকে ধারণাবশত দোষারোপ করা হলে সে হয়তো কিছু মনে করবে না। কিন্তু যখন কাউকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোনো বিষয়ে দোষ দেওয়া হয়, তখন সে অপমানিত ও বিব্রত বোধ করে। উপযুক্ত প্রমাণাদি হাতে না আসা পর্যন্ত কাউকে অপবাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকব আমরা।

৭/সর্বশেষ পর্যবেক্ষণটি হচ্ছে, কথোপকথনটিকে সুন্দরভাবে শেষ করা। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কারণ আলাপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, এর মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে পরিবারের সদস্যদের জ্ঞাত করা। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে, পারিবারিক কথোপকথনের উদ্দ্যেশ্য থাকে, কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধান করা অথবা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সবার পরামর্শ নেওয়া। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই মূল লক্ষ্যগুলো হারিয়ে যায়। আর আত্মিক ও নৈতিকতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করার পরিবর্তে কথোপকথন পরিণত হয় একে অপরকে অপমান-অপদস্থ করার, অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়ার, অপরকে পরাজিত করার সুযোগ খুঁজতে থাকার এবং অন্যের যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার হাতিয়ারে।

এমন কিছু ঘটলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার পারস্পরিক ভালোবাসা, সহানুভূতি ও সম্মানের প্রতি খেয়াল রেখে উভয় পক্ষেরই উচিত আলোচনাটি সাথে সাথেই থামিয়ে দেওয়া। এটাই যৌক্তিক।

আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাড়ে চৌদ্দশ' বছর আগেই আমাদের এমন বিতর্ক করতে নিরৎসাহিত করেছেন, যেখানে একবারের জন্যেও আমাদের মনে হয় যে, আমরা কথার আসল উদ্দেশ্য থেকে সরে আসছি। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও তর্ক পরিহার করল, তার জন্য আমি জান্নাতে একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিচ্ছি। যে ব্যক্তি ঠাট্টার ছলেও মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকল, তার জন্য আমি জান্নাতের ঠিক মাঝখানে একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিলাম। আর যে ব্যক্তি উত্তম আখলাক বজায় রাখল, তার জন্য আমি জান্নাতের সর্বোত্তম অংশে একটি ঘরের নিশ্চয়তা দিলাম।'[সুনানু আবি দাউদ:৪৮০০]

এরকম পরিস্থিতিতে তর্ক পরিহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। শান্তভাবে কথা বলার জন্য উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

অনেকেই হয়তো ভাবছেন, কথোপকথনের জন্য এত দীর্ঘ আলোচনার কী দরকার? আপনি কি আপনার বাসাকে সাংস্কৃতিক বা সম্মেলনকেন্দ্রে পরিণত করতে চান? আর

নিরক্ষর ও সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষদের মাঝে এগুলো ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠা করা কি আদৌ সম্ভব? জি হ্যাঁ, আমরা আমাদের ঘরগুলোকে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পরিণত করতে চাই। আর কথোপকথনই পারে তাদেরকে ঘষেমেজে উন্নত ও উপকারী কাজের জন্য উপযোগী করে গড়ে তুলতে। আর এটা নিশ্চয়ই মুসলিমদের প্রাপ্য।

মনে রাখবেন-

》 বেশকিছু কারণেই বন্ধু বা সহকর্মীদের সাথে কথা বলার চেয়েও পরিবারের মানুষগুলোর সাথে কথা বলাটা কঠিন।
》 পরিবারের প্রতিটি সদস্যের মধ্যকার বন্ধনকে সুদৃঢ় করাই কথোপকথনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত।
》 আলাপটি যেন বৃথা না যায় সেজন্য পরিবারের সকলের জন্য সুবিধাজনক হয় এমন একটি সময় নির্ধারণ করতে হবে।
》 পরিবারের একজন আরেকজনকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য বা কটাক্ষ করে কথা বললে, তাদেরকে একসাথে বসানো যাবে না।
》 পরিবারের বড়দের দায়িত্ব হচ্ছে, ছোটদের অংশগ্রহণকে স্বাগত জানানো এবং তাদের ভালো ভালো পরামর্শগুলোকে সাদরে গ্রহণ করা এবং সেগুলোর প্রশংসা করা।
》 কথোপকথন যেন কলহে রূপান্তরিত না হয় এবং কেউ যেন অমার্জিত ভাষায় কথা না বলে সেদিকে আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।
》 একটি উপকারী আলাপচারিতা যেন বিশৃঙ্খল পরিবেশে পরিণত না হয়, সেজন্য একজন যথাযোগ্য পরিচালক প্রয়োজন।
》 এক বৈঠকে যেন একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা না হয়। আর সেখানে ১২ বছরের কমবয়সি কেউ থাকলে আলাপচারিতা যেন আধঘণ্টার বেশি না গড়ায় সেটাও মাথায় রাখতে হবে।

পশ্চিমা পরিবার বনাম ইসলামিক পরিবার

বর্তমান বিশ্বে পরিবারব্যবস্থার দুটি ভিন্ন ধারা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়—পশ্চিমা পরিবারব্যবস্থা এবং ইসলামিক পরিবারব্যবস্থা। উভয় ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য পরিবার গঠন হলেও আদর্শ, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ ও পারিবারিক কাঠামোর দিক থেকে এদের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। ইসলাম পরিবারকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে দেখে, আর পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে পরিবার পরিচালনার ধরনেও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

পশ্চিমা পরিবারব্যবস্থায় সাধারণত ব্যক্তি স্বাধীনতা ও আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাধারাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেখানে পরিবারের চেয়ে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, ক্যারিয়ার, ভোগ-বিলাস ও স্বাধীন জীবনযাপনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অনেক সময় শুধুমাত্র পারস্পরিক সুবিধা ও মানসিক সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে। সামান্য মতবিরোধ বা অসন্তুষ্টিতেই বিচ্ছেদের হার বৃদ্ধি পায়। ফলে সন্তানরা অনেক সময় পিতামাতার স্নেহ, আদর্শ ও নিরাপদ পারিবারিক পরিবেশ থেকে বঞ্চিত হয়। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধও দিন দিন কমে যাচ্ছে; তাদের অনেককে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সমাজে একাকীত্ব, হতাশা ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে ইসলামিক পরিবারব্যবস্থা গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিধান, পারস্পরিক ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও নৈতিকতার ভিত্তিতে। ইসলামে পরিবার শুধুমাত্র একসাথে বসবাসের নাম নয়; বরং এটি একটি ইবাদতপূর্ণ বন্ধন। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী, শান্তির মাধ্যম ও আমানত হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”[সূরা আর-রূম : ২১]

ইসলামে স্বামীকে পরিবারের অভিভাবক এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্বশীল করা হয়েছে। অপরদিকে স্ত্রীকে পরিবার, সন্তান ও ঘর-সংসার সুন্দরভাবে পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে এটি কোনো প্রতিযোগিতা নয়; বরং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক। ইসলামে পিতা-মাতার সম্মান, আত্মীয়তার

বন্ধন রক্ষা, সন্তানদের সুশিক্ষা ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে যেখানে অবাধ সম্পর্ক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে ইসলাম বৈধ সম্পর্ক, লজ্জাশীলতা ও পারিবারিক পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেয়। ইসলামিক পরিবারে সন্তানরা ধর্মীয় শিক্ষা, আদব-আখলাক ও মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে বেড়ে ওঠে। ফলে একটি সুস্থ, শান্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীল সমাজ গড়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, পশ্চিমা পরিবারব্যবস্থা যেখানে ধীরে ধীরে পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করছে, সেখানে ইসলামিক পরিবারব্যবস্থা পরিবারকে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ব ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে দৃঢ় ও কল্যাণময় করে তোলে। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামিক পরিবারব্যবস্থার বিকল্প নেই।

মিডিয়া ও সমাজের প্রভাব

বর্তমান যুগকে তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ বলা হয়। মানুষের চিন্তা-চেতনা, জীবনযাপন, সংস্কৃতি ও পারিবারিক মূল্যবোধ গঠনে মিডিয়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টেলিভিশন, সিনেমা, ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গেছে। মিডিয়া যেমন সমাজকে সচেতন ও শিক্ষিত করতে পারে, তেমনি ভুল ব্যবহার সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ও পারিবারিক সংকটও সৃষ্টি করতে পারে।

ইসলাম মানুষের চরিত্র, লজ্জাশীলতা ও পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান অনেক মিডিয়ায় অশ্লীলতা, অবাধ সম্পর্ক, বেপর্দা সংস্কৃতি ও ভোগবাদকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে তরুণ সমাজ ধীরে ধীরে ইসলামি মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। বিশেষ করে পরিবারব্যবস্থার উপর এর নেতিবাচক প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অবিশ্বাস, অতিরিক্ত চাহিদা, পারস্পরিক তুলনা এবং দাম্পত্য অসন্তোষ অনেক সময় মিডিয়ার প্রভাব থেকেই সৃষ্টি হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের সময় অপচয়, আসক্তি ও পারিবারিক দূরত্বও বৃদ্ধি করছে। একই ঘরে বসবাস করেও অনেকে একে অপরের সঙ্গে সময় না

কাটিয়ে মোবাইল ও ভার্চুয়াল জগতে ডুবে থাকে। ফলে পরিবারে আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক বোঝাপড়া কমে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানরাও মিডিয়ার নেতিবাচক কনটেন্ট দেখে নৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে।
তবে মিডিয়ার ইতিবাচক দিকও রয়েছে। ইসলামি জ্ঞান প্রচার, কুরআন-হাদিস শিক্ষা, নৈতিকতা বৃদ্ধি, সমাজসেবা ও দাওয়াহর কাজে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একজন মানুষ যদি সচেতনভাবে ভালো কনটেন্ট গ্রহণ করে, তবে মিডিয়া তার জ্ঞান ও ঈমান বৃদ্ধির মাধ্যম হতে পারে।

এ কারণে মুসলিম পরিবারকে মিডিয়া ব্যবহারে সচেতন হতে হবে। সন্তানদের জন্য উপকারী ও ইসলামসম্মত কনটেন্ট নির্বাচন করা, অপ্রয়োজনীয় মিডিয়া ব্যবহার সীমিত করা এবং পরিবারে বাস্তব সম্পর্ক ও ইসলামি পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

কুরআন ও হাদিসের আলোকে-
১. আল্লাহ তাআলা বলেন:
“নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর— এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
[সূরা আল-ইসরা : ৩৬]

২. আল্লাহ তাআলা বলেন:
“মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।”
[সূরা আন-নূর : ৩০]

৩.রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
[সহিহ বুখারি,হা/৮৯৩;মুসলিম, হা/১৮২৯]

৪.আল্লাহ তাআলা বলেন:

“নিশ্চয়ই যারা চায় মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্য রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।”
[সূরা আন-নূর : ১৯]

বর্তমান মিডিয়ার অনেক অশ্লীল ও অনৈতিক বিষয় এই আয়াতের সতর্কবার্তার অন্তর্ভুক্ত।

তাই একজন মুসলিমের উচিত মিডিয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতা, সংযম ও তাকওয়া অবলম্বন করা, যাতে পরিবার ও সমাজ ইসলামি আদর্শে সুসংগঠিত থাকতে পারে।

পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য

মানুষ স্বভাবগতভাবেই সামাজিক জীব। একা জীবনযাপন মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আল্লাহ তাআলা মানবজীবনে শান্তি, ভালোবাসা, নিরাপত্তা ও বংশধারা রক্ষার জন্য পরিবারব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন। ইসলামে পরিবার শুধুমাত্র রক্তের সম্পর্ক বা একসাথে বসবাসের নাম নয়; বরং এটি একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। একটি আদর্শ পরিবার থেকেই আদর্শ সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে।
ইসলামে পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য কেবল দুনিয়াবি চাহিদা পূরণ নয়; বরং দ্বীন রক্ষা, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা, সন্তানদের সুশিক্ষা প্রদান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনও এর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। নিচে পরিবার গঠনের কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলো—

১. শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি অর্জন-

পরিবার মানুষের জীবনে ভালোবাসা, স্নেহ, নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তির উৎস। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী ও শান্তির মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা বলেন—
“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”
[সূরা আর-রূম : ২১]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, পরিবার গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দাম্পত্য জীবনে শান্তি, মমতা ও পারস্পরিক ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা করা।

২. দ্বীন ও চরিত্রের হেফাজত-

ইসলাম মানুষকে অবৈধ সম্পর্ক ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচানোর জন্য বৈধ পারিবারিক জীবনকে উৎসাহিত করেছে। পরিবার মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করে এবং চরিত্রকে পবিত্র রাখে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কারণ এটি দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতে অধিক সহায়ক।"

[বুখারি, হা/৫০৬৬;মুসলিম, হা/১৪০০]

অর্থাৎ পরিবার মানুষকে নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে এবং পবিত্র জীবন গঠনে সহায়তা করে।

৩. বংশধারা সংরক্ষণ-

মানবজাতির অস্তিত্ব ও বংশধারা রক্ষার জন্য পরিবার অপরিহার্য। ইসলাম বৈধ বিবাহের মাধ্যমে সুন্দর ও পবিত্রভাবে বংশবিস্তারকে উৎসাহিত করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের মাধ্যমে তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনি দান করেছেন।"

[সূরা আন-নাহল : ৭২]

সন্তান আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। পরিবারই সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় ও সুশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান।

৪. সন্তানদের ইসলামি শিক্ষা ও চরিত্র গঠন-

একটি শিশুর চরিত্র, আখলাক ও জীবনদর্শন প্রথমে পরিবার থেকেই গড়ে ওঠে। তাই পরিবারকে ইসলামে "প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান" বলা হয়। পিতা-মাতার দায়িত্ব হলো সন্তানকে দ্বীন, নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”
[সূরা আত-তাহরীম : ৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
[বুখারি, হা/৮৯৩]

এ থেকে বোঝা যায়, সন্তানদের সঠিক শিক্ষা ও চরিত্র গঠন পরিবার গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

৫. সমাজে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা-

পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। পরিবার ভালো হলে সমাজও ভালো হয়। একটি সুস্থ পরিবার সমাজে নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ, মানবিকতা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে। বিপরীতে পরিবার ভেঙে গেলে সমাজে অপরাধ, অবক্ষয় ও বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়।

ইসলাম পারিবারিক সম্পর্ক, আত্মীয়তার বন্ধন ও পারস্পরিক দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবার মানুষকে সামাজিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতা শিক্ষা দেয়।

৬. আল্লাহর ইবাদত ও সন্তুষ্টি অর্জন-

ইসলামে পরিবার গঠন কেবল সামাজিক প্রয়োজন নয়; বরং এটি ইবাদতের অংশ। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের হক আদায় করলে এবং সন্তানদের দ্বীনের পথে গড়ে তুললে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”
[জামে আত-তিরমিযি, হাদিস : ৩৮৯৫]
অতএব পরিবার গঠন ইসলামে একটি মহান দায়িত্ব ও ইবাদত।

পরিবার মানবজীবনের শান্তি, নিরাপত্তা ও নৈতিকতার মূল কেন্দ্র। ইসলাম পরিবারকে এমন একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, যেখানে ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ ও আল্লাহভীতি বিদ্যমান থাকে। পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য কেবল পার্থিব সুখ নয়; বরং একটি ঈমানদার, নৈতিক ও কল্যাণময় সমাজ গঠন করা। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত পরিবারকে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তোলা এবং পারিবারিক জীবনে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

পারিবারিক জীবনের সুফল-

পরিবার একটি সার্বজনীন পদ্ধতি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের আয়না। সারা বিশ্বে পরিবার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়। পরিবার একজন মানুষের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ একেকটি পরিবার বহু হৃদয়ের সমষ্টি; যেখানে আছে জীবনের প্রবাহ, আছে মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, মিলেমিশে থাকার প্রবল বাসনা, আছে নিরাপত্তা, সহনশীলতা এবং পরস্পরকে গ্রহণ করার মানসিকতা। বিশ্বের প্রতিটি দেশে ও জাতির নিকটে পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণ, সমমর্যাদার নিশ্চয়তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক অগ্রগতি সাধন ও জীবন মান উন্নয়নে পরিবার সমাজের স্তম্ভ ও মৌলিক ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। পরিবার এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ নির্দেশনা। পারিবারিক বন্ধন থেকেই মানব বংশ সম্প্রসারিত হয়েছে। যদি সকল মানুষ। পরিবারে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে তবে সে পরিবার সমাজে উত্তম ও আদর্শ পরিবার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যেখানে বইতে থাকে শান্তির ফল্গুধারা। পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন হবে সুখকর ও আনন্দময়। স্মর্তব্য যে, ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে একটি দেশ বা রাষ্ট্র গঠিত হয়। তাই ব্যক্তি ভালো হ'লে পরিবার ভালো হবে, পরিবার ভালো হ'লে সমাজ ভাল হবে। আর সমাজ ভালো হ'লে দেশ বা রাষ্ট্র ভালো চলবে। সমাজে এখনো বহু ভালো মানুষ আছেন, যারা প্রকৃতপক্ষেই চান যে, সমাজে ভালো মানুষই থাকুক, মানবরূপী কোন দানব না থাকুক। ব্যক্তি সংশোধনের মাধ্যমে পরিবার ঠিক করে ঐসব

মানবরূপী দানবদের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে হবে। ফিরিয়ে আনতে হবে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা এবং মজবুত করতে হবে পারস্পরিক সম্পর্কের সেতু বন্ধন। এক্ষেত্রে একে অন্যের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে সুন্দর পরিবার গঠন ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা আমাদের জন্য একান্ত কর্তব্য। পরিবার নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একটি শিশু সুনাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। শিশুরা পরিবারে যে শিক্ষা পায় বড় হয়ে সে ঐ শিক্ষানুযায়ী চলে। আর পরিবারে একই সঙ্গে মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি মিলেমিশে থাকে। একজনের সুখে অন্যজন আনন্দিত হয় এবং একজনের দুঃখে অন্যজন অশ্রু ঝরায়। এ নিবিড় বন্ধন থাকে কেবল পরিবারের মধ্যে। ফলে সদস্যরা একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পরিবারের সদস্যরা যখন আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকবে; স্ত্রী যখন তার অধিকার পূর্ণভাবে লাভ করবে; স্বামী স্ত্রীর নিকট তার অধিকার পাবে, সন্তান পিতা-মাতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্য লাভ করবে ও তাদের অধিকার পাবে; আত্মীয়-স্বজন যখন পরস্পরের যথাযথ সম্মান-মর্যাদা পাবে, তখন কোন স্ত্রী অধিকারের দাবীতে প্রকাশ্য রাজপথে বের হবে না, কোন স্বামী ভালোবাসা ও সুন্দর জীবন-যাপনের প্রত্যাশায় অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবে না, কোন সন্তানই পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করবে না। বরং পরিবারে সবার মাঝে সুসম্পর্কের কারণে আল্লাহর রহমত, অনুগ্রহ-অনুকম্পা বর্ষিত হ'তে থাকবে। অপরদিকে ইসলাম নির্দেশিত পারিবারিক জীবন হ'ল আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ। মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত পারিবারিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হ'লে সমাজ থেকে পরকীয়া, লিভটুগেদার, মাদকাসক্তি, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ-অপহরণ, ধর্ষণ পরবর্তী হত্যা ও প্রেমে ব্যর্থদের আত্মহত্যাসহ সকল প্রকার অপরাধ নির্মূল হবে। জীবনের পড়ন্ত বেলায় বৃদ্ধাশ্রমে ঠাঁই নিয়ে নীরবে অশ্রু ঝরানোর মতো দুঃসহ জীবন-যাপন বন্ধ হবে। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে আল্লাহ ও রাসূল (সা:)-এর নির্দেশ মেনে চলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।

কুরআন ও হাদিসে পরিবারের গুরুত্ব

ইসলামে পরিবার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র প্রতিষ্ঠান। মানবসমাজের শান্তি, শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা রক্ষার মূল ভিত্তি হলো পরিবার। কুরআন ও হাদিসে পরিবারকে শুধু সামাজিক প্রয়োজন হিসেবে নয়; বরং আল্লাহপ্রদত্ত একটি আমানত ও ইবাদতের ক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি সুশৃঙ্খল পরিবার থেকেই আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলাম পরিবার গঠন, পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা এবং পরিবারের সদস্যদের অধিকার আদায়ের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে।

১. পরিবার আল্লাহর একটি নিদর্শন ও শান্তির উৎস:

মানুষের জীবনে মানসিক প্রশান্তি, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা প্রদানের জন্য আল্লাহ পরিবারব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ইসলাম দয়া ও ভালোবাসার বন্ধন হিসেবে বর্ণনা করেছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”
[সূরা আর-রূম : ২১]
এই আয়াত প্রমাণ করে যে, পরিবার মানুষের মানসিক শান্তি ও আবেগিক নিরাপত্তার অন্যতম মাধ্যম।

২. পরিবার দ্বীন ও চরিত্র রক্ষার মাধ্যম:
ইসলাম পরিবারকে মানুষের চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। বৈধ বিবাহ ও পারিবারিক জীবন মানুষকে অশ্লীলতা ও পাপ থেকে দূরে রাখে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কারণ এটি দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতে অধিক সহায়ক।”

[বুখারি, হা/৫০৬৬;মুসলিম,হা/ ১৪০০]
অর্থাৎ পরিবার মানুষকে নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে।

৩. পরিবার সন্তানদের প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান:
একটি শিশুর চরিত্র, আদর্শ ও দ্বীনি শিক্ষা সর্বপ্রথম পরিবার থেকেই শুরু হয়। পিতা-মাতা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। ইসলামে সন্তানদের সুশিক্ষা ও উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"
[সূরা আত-তাহরীম : ৬]
হযরত আলী (রা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন—
"তাদেরকে শিক্ষা দাও এবং আদব শেখাও।"
এটি প্রমাণ করে যে, পরিবার শুধুমাত্র ভরণ-পোষণের স্থান নয়; বরং দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র।

৪. পিতা-মাতার সম্মান ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা:
ইসলাম পরিবারে পিতা-মাতার মর্যাদা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
"তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"
[সূরা আল-ইসরা : ২৩]
আরও বলেন—
"আর আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক প্রদান করো।"
[সূরা আল-ইসরা : ২৬]
এই আয়াতগুলো পরিবার ও আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

৫. পরিবারে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতা

ইসলামে পরিবারের প্রতিটি সদস্যের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। স্বামী, স্ত্রী, পিতা-মাতা—সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"

[বুখারি,হা/৮৯৩]

এই হাদিস পরিবার পরিচালনায় দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার গুরুত্ব তুলে ধরে।

৬. পরিবারের সাথে উত্তম আচরণের গুরুত্ব

ইসলামে পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর আচরণ করাকে ঈমান ও উত্তম চরিত্রের অংশ বলা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।"

[তিরমিযি, হা/৩৮৯৫]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, একজন মানুষের প্রকৃত চরিত্র তার পারিবারিক আচরণের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

৭. পরিবার সমাজের ভিত্তি

একটি সুস্থ পরিবার থেকেই সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। পরিবার ধ্বংস হলে সমাজেও অস্থিরতা, অপরাধ ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায়। তাই ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে।

ইসলাম পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া, সহযোগিতা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে পরিবারকে টিকিয়ে রাখার শিক্ষা দেয়। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত পরিবার সমাজে শান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে।

কুরআন ও হাদিসে পরিবারকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরিবার মানুষের ঈমান, চরিত্র, শিক্ষা ও সমাজজীবনের ভিত্তি। একটি ইসলামি পরিবার কেবল দুনিয়াবি সুখের মাধ্যম নয়; বরং আখিরাতের সফলতারও

পথ। তাই প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্ব হলো পরিবারকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালনা করা, পারিবারিক সম্পর্ক রক্ষা করা এবং পরিবারে ভালোবাসা, দয়া ও তাকওয়ার পরিবেশ গড়ে তোলা।

অধ্যায়-২:বিয়ের গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য

বিয়ের ফজিলত

ইসলামে বিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও পবিত্র সুন্নাহ। এটি শুধু পারিবারিক জীবন শুরু করার মাধ্যম নয়; বরং চরিত্র রক্ষা, সমাজে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম উপায়। ইসলাম মানুষকে বৈধ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য বিয়েকে উৎসাহিত করেছে। কুরআন ও হাদিসে বিয়ের বহু ফজিলত ও গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

》 বিয়ে নবীদের সুন্নাহ-

বিয়ে আল্লাহর নবীগণের সুন্নাহ। সকল নবীই বৈবাহিক জীবন গ্রহণ করেছেন। তাই বিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া ইসলামের আদর্শের পরিপন্থী।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর অবশ্যই আমি তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি।”

[সূরা আর-রা‘দ : ৩৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“বিয়ে আমার সুন্নাহ। যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

[সুনান ইবনে মাজাহ, হা/১৮৪৬]

》 বিয়ে চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষা করে-

বিয়ে মানুষকে অশ্লীলতা, অবৈধ সম্পর্ক ও নৈতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে। এটি দৃষ্টি সংযত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতে সহায়তা করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কারণ এটি দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতে অধিক সহায়ক।”

[বুখারি, হাদিস : ৫০৬৬; মুসলিম, হা/১৪০০]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, বিয়ে মানুষের চরিত্র সংরক্ষণের অন্যতম মাধ্যম।

》 বিয়ে মানসিক শান্তি ও ভালোবাসার উৎস-

আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে ভালোবাসা, দয়া ও প্রশান্তির বন্ধন হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—
"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।"
[সূরা আর-রূম : ২১]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, বিয়ের মাধ্যমে মানুষ মানসিক প্রশান্তি ও পারিবারিক সুখ লাভ করে।

》 বিয়ে দ্বীনের পূর্ণতার কারণ-

ইসলামে বিয়েকে দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"যে ব্যক্তি বিয়ে করল, সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। অতএব অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।"
[শু'আবুল ঈমান, হা/৫১০০]

》 বিয়ে রিজিক ও বরকতের কারণ-

অনেক মানুষ দারিদ্র্যের ভয়ে বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ বিয়ের মাধ্যমে বরকত ও রিজিক বৃদ্ধি করেন।
আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ে দাও... তারা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন।”
[সূরা আন-নূর : ৩২]

এই আয়াত বিয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে শিক্ষা দেয়।

》 নেক সন্তান লাভের মাধ্যম-
বিয়ে বৈধ ও পবিত্রভাবে বংশধারা রক্ষার উপায়। নেক সন্তান একটি সদকায়ে জারিয়া, যা মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য সওয়াবের কারণ হয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—
“মানুষ মারা গেলে তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি আমল বন্ধ হয় না—সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।”
[সহিহ মুসলিম, হা/১৬৩১]

বিয়ে শুধু ব্যক্তি নয়; বরং পুরো সমাজকে অশ্লীলতা ও বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা করে। সুস্থ পরিবার থেকেই সুস্থ সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলাম বিয়েকে সহজ করতে এবং হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে উৎসাহ দিয়েছে।

ইসলামে বিয়ে একটি মহান ইবাদত, গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ এবং পবিত্র জীবনব্যবস্থা। এটি মানুষের চরিত্র রক্ষা করে, মানসিক প্রশান্তি দেয়, সমাজে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ তৈরি করে। তাই প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের উচিত বিয়েকে গুরুত্ব দেওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে একটি আদর্শ পরিবার গঠন করা।

বিয়ের মূল উদ্দেশ্য

ইসলামে বিয়ে শুধুমাত্র জৈবিক চাহিদা পূরণ বা সামাজিক আনুষ্ঠানিকতার নাম নয়; বরং এটি একটি পবিত্র বন্ধন, গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং মানবজীবনের অপরিহার্য ব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তি, পবিত্রতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য বিয়ার বিধান দিয়েছেন। কুরআন ও হাদিসে বিয়ের বহু উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে।

নিচে বিয়ের কয়েকটি প্রধান উদ্দেশ্য আলোচনা করা হলো—

১. মানসিক শান্তি ও ভালোবাসা অর্জন-

বিয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বামী-স্ত্রীর মাঝে শান্তি, ভালোবাসা ও দয়া প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ যেন দাম্পত্য জীবনে প্রশান্তি ও নিরাপত্তা পায়, সে জন্য আল্লাহ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।”

[সূরা আর-রূম : ২১]

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, বিয়ে মানুষের আবেগিক ও মানসিক প্রশান্তির অন্যতম মাধ্যম।

২. চরিত্র ও পবিত্রতা রক্ষা-

ইসলাম মানুষকে অশ্লীলতা, ব্যভিচার ও হারাম সম্পর্ক থেকে বাঁচানোর জন্য বিয়েকে বৈধ পথ হিসেবে নির্ধারণ করেছে। বিয়ে মানুষের দৃষ্টি ও চরিত্র সংরক্ষণে সহায়ক। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কারণ এটি দৃষ্টি অবনত রাখতে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজতে অধিক সহায়ক।”

[বুখারি, হা/৫০৬৬;মুসলিম, হা/১৪০০]

অতএব বিয়ে নৈতিক অবক্ষয় থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

৩.দ্বীন পূর্ণ করা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন-
ইসলামে বিয়ে একটি ইবাদত। সঠিক নিয়ত ও ইসলামি পদ্ধতিতে দাম্পত্য জীবন পরিচালনা করলে তা সওয়াবের কারণ হয়।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—
"যে ব্যক্তি বিয়ে করল, সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল। অতএব অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।"
[শু'আবুল ঈমান, হা/৫১০০]
এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, বিয়ে মানুষের দ্বীনি জীবনকে সুসংগঠিত করে।

৪.পারস্পরিক সহযোগিতা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টি-
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক। তারা সুখ-দুঃখে একে অপরকে সহায়তা করে এবং একটি সুন্দর পরিবার গঠনে ভূমিকা রাখে।
আল্লাহ তাআলা বলেন—
"তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।"
[সূরা আল-বাকারা : ১৮৭]

এই আয়াত স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা, নিরাপত্তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার সুন্দর উপমা তুলে ধরে।

ইসলামে বিয়ে একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য কেবল জৈবিক চাহিদা পূরণ নয়; বরং মানসিক প্রশান্তি অর্জন, চরিত্র রক্ষা, বংশধারা সংরক্ষণ, দ্বীন পূর্ণ করা এবং একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠন করা। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত দাম্পত্য জীবন দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের সফলতার পথ প্রশস্ত করে।

উত্তম ও নেককার জীবনসঙ্গী নির্বাচন করা

পরিবারের কল্যাণ ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ঈমানদার নারীকে বিবাহ করা যরূরী। মুমিনা সতি-সাধ্বী নারী স্বামীর সংসার, সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য সদস্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকে। সাথে সাথে দ্বীনী কাজে সহায়তা করে। এজন্য মুমিনা নারীকে বিবাহ করতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। যদি সে কুৎসিত অসুন্দরও হয়।

আল্লাহ বলেন- 'আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাসী মুশরিক স্বাধীন নারীর চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। আর তোমরা মুশরিক পুরুষদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। (মনে রেখ) মুমিন ক্রীতদাস মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চাইতে উত্তম। যদিও সে তোমাদের বিমোহিত করে। ওরা জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে। আর আল্লাহ স্বীয় আদেশক্রমে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানবজাতির জন্য স্বীয় আয়াত সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে' ।(সুরা বাক্বারাহ:২২১)

নারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (সা:) বলেন- 'নারীকে বিবাহ করা হয় চারটি কারণে- (১) তার সম্পদ (২) বংশ মর্যাদা (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) তার দ্বীনদারির কারণে। এর মধ্যে তুমি দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও। নইলে তুমি কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে'।[বুখারী হা/৫০৯০;বিবাহ অধ্যায়]

অন্যত্র রাসূল (সা:) বলেন- তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলে, যার চরিত্র ও ধার্মিকতা সম্পর্কে তোমরা সন্তুষ্ট, তার সাথে (তোমাদের মেয়েদের) বিবাহ দাও। তোমরা যদি তা না করো, তাহ'লে পৃথিবীতে বিপর্যয় ও ব্যাপক বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে'।[তিরমিযী হা/১০৮৪;ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭;ইরওয়া হা/১৮৬৮,সহিহ হা/১০২২,সনদ হাসান]

সুতরাং দ্বীনদার নারীকে বিবাহ করতে হবে।আর মুমিনা উত্তম স্ত্রী পাওয়ার জন্য আগ্রহী হওয়া ও আল্লাহর সাহায্য কামনা করা জরুরী।রাসূল (সা:) বলেন- তুমি

তোমার জন্য উপকারী জিনিসের আকাঙ্খা কর এবং আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। [মুসলিম হা/২৬৬৪]

মুমিনা হওয়ার পরও নারীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য থাকলে তাকে উত্তম স্ত্রী হিসাবে গণ্য হয়, তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।

》 সতী-সাধ্বী, অনুগত ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী:

সেই উত্তম নারী যে সতী-সাধ্বী ও অনুগত এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতেও স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযতকারিণী। আল্লাহ বলেন অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' (সুরা নিসা:৩৪)।

আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি হ'ল আল্লাহ্ সাথে সংশ্লিষ্ট। অপরটি স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্র সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ তথা সে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পুরাপুরি মেনে চলে, তাঁর ইবাদত নিয়মিত আদায় করে এবং দ্বীনের আবশ্যিক বিষয়গুলি পালনে অলসতা করে না। এসবই আল্লাহর অনুগত হওয়ার পরিচায়ক। স্বামীর সাথে সম্পৃক্ত গুণ তথা স্বামীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে তার হক আদায় করে এবং তার সন্তানাদি ও সম্পদ হেফাযত করে। আর নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করে।

রাসূল (সা:) বলেন-নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রমযান মাসের সিয়াম পালন করবে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, স্বামীর আনুগত্য করবে তখন জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে'।[সহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪১৬৩;মিশকাত হা/৩২৫৪]

নারীর লজ্জাস্থান হেফাজত করা তার সবচেয়ে বড়গুণ। কারণ এর দ্বারা বিপর্যয়-বিশৃংখলার পথ বন্ধ হয়। আর এর অভাবে সংসারে সর্বপ্রকার অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রবেশ করে এবং পাপাচারের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং লজ্জাস্থানের হেফাজত নারীর কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য। তাই যে নারী তার নিজের কল্যাণ কামনা করে সে যেন নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর ইবাদতে রত থাকে এবং স্বীয় কথা-কর্মের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে। সেই স্বামীর অনুগত

থাকবে এবং নিজের লজ্জাস্থান হেফাযত করবে ও স্বামীর হক আদায়ে সদা তৎপর থাকবে।

》 দ্বীন ও ঈমানের কাজে সহযোগী:
মুমিন নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগী হবে। নেকীর কাজে উৎসাহিত করবে এবং পাপের কাজে বাধা দিবে; এটাই হবে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন- 'আর মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে নিষেধ করে। তারা ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাবান' (সুরা তাওবা:৭১)।
মুমিনা নারীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ অভিহিত করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে-
সাওবান (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করেনা তাদেরকে পীড়াদায়ক আজাবের সুসংবাদ দাও। (সুরা তাওবা:৩৪)

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সময় আমরা নবী করীম (সা:)-এর সাথে সফরে ছিলাম। কোন কোন সাহাবী বলেন, এ আয়াতটি সোনা ও রূপার সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছে। কোন সম্পদ উৎকৃষ্ট আমরা তা জানতে পারলে তা জমা করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা:) বললেন, উৎকৃষ্ট সম্পদ হ'ল (আল্লাহ তা'আলার) যিকরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর ও ঈমানদার স্ত্রী, যে স্বামীকে দ্বীনদারীর ব্যাপারে সহযোগিতা করে'।[ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৬]

অন্যত্র রাসূল (সা:) বলেন- তোমাদের লোকেরা যেন অর্জন করে কৃতজ্ঞ অন্তর, যিকরকারী জিহ্বা এবং আখেরাতের কাজে তাকে সহায়তাকারী ঈমানদার স্ত্রী'।[তিরমিযী হা/৩০৯৪]

》 প্রেম-ভালবাসা বিনিময়কারিণী: স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক বজায় থাকা পরিবারে শান্তি বজায় থাকার অন্যতম শর্ত। এ সম্পর্ক অটুট রাখার জন্য স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি

প্রেমময়ী হওয়া জরুরী। এতে অন্য নারীর প্রতি স্বামীর মনে কখনো কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না এবং তার বিপথগামী হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে না। আর এ ধরনের নারীর জন্যই জান্নাত রয়েছে। রাসূল (সা:) বলেন- তোমাদের জান্নাতী রমণীগণ হচ্ছে যারা স্বামীর প্রতি প্রেমময়ী ও স্বামীর নিকটে বারবার আগমনকারিণী। স্বামী ক্রুদ্ধ হ'লে সে এসে স্বামীর হাতে হাত রেখে বলে, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'।[সহীহুল জামে হা/২৬০৪]

》 স্বামীকে মুগ্ধকারিণী: উত্তম স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিজের প্রতি স্বামীকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেটা কয়েকভাবে হতে পারে। নিজের আকার-আকৃতিকে কেবল স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য সুন্দর করা। স্বামীর সামনে সুন্দর ও পরিচ্ছন পোশাক পরিধান করে সর্বদা স্বামীকে নিজের দিকে আকর্ষিত করার চেষ্টা করা। সেই সাথে স্বামী যে ধরনের পোশাক পসন্দ করে সেগুলো পরিধান করা কেবল স্বামীর নজর কাড়ার জন্য। আচার-ব্যবহারে সর্বদা খোশ মেজাজি ও হাসি-খুশী থাকা। কথা-বার্তার ক্ষেত্রে সর্বদা মিষ্টি হাসিতে স্বামীর মন জয় করে নেওয়া। স্বামীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তার অনুগত থাকা এবং তাঁর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করা। এক্ষেত্রে কোন প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করা। ঐসব বিষয়ে হাদীসে এসেছে, রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞেস করা হলো কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়; যখন সে নির্দেশ দেয়, তা মান্য করে। তার নিজের ও স্বামীর সম্পদের ব্যাপারে স্বামীর বিরোধিতা করে না'।[নাসাঈ হা/৩২৩১]
অর্থাৎ নিজে স্বামীর অপছন্দনীয় কাজ করবে না এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে তার সম্পদ খরচ করবে না।
অন্যত্র রাসূল (সা:) বলেন-আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্ব ও তার সম্পদের হেফাযত করে।[আবু দাউদ হা/১৬৬৪]
উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, নারীর সব কিছুই হবে স্বামীকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় হচ্ছে নারী স্বামীর জন্য নিজেকে মোহনীয় ও সুসজ্জিত করে

না। বরং সে নিজেকে সুশোভিত করে কেবল বাড়ির বাইরে যাওয়ার জন্য বা কোন পার্টি ও উৎসবে অংশগ্রহণ কিংবা কোন বিশেষ কারো বাড়ীতে গমনের জন্য। পক্ষান্তরে স্বামীর কাছে যখন থাকে তখন অপরিস্কার-অপরিচ্ছন্ন কাপড়ে থাকে, চুল থাকে এলোমেলো ও অপরিপাটি, শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। এছাড়া আরো অন্যান্য খারাপ গুণ তার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফলে স্বামী তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার পরিবর্তে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে।

》 বিপদাপদে সান্ত্বনা দানকারিণী: মানুষ বিভিন্ন বিপদাপদ ও অসুখ-বিসুখে অনেক সময় মুষড়ে পড়ে। এসময় তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আদর্শ ও গুণবতী স্ত্রীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বিপদে স্বামীকে সান্ত্বনা দেওয়া ও ধৈর্য ধারণে সাহায্য করা। রাসূল (সা:) আরো বলেন-
তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে উত্তম হ'ল যারা প্রেমময়ী, অধিক সন্তান প্রসবকারিণী, সান্ত্বনাদানকারিণী ও (স্বামীর) অনুগতা যখন তারা আল্লাহকে ভয় করে'।[বায়হাক্বী,আস-সুনানুল কুবরা;সহিহুল জামে হা/৩৩৩০]
এক্ষেত্রে প্রথম অহী নাযিলের প্রাক্কালে উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রাঃ) কর্তৃক রাসূল (সা:)-কে প্রদত্ত সান্ত্বনাবাণী বিশেষভাবে স্মরণীয় ও অনুকরণীয়। অনুরূপভাবে উম্মে সুলাইম (রাঃ) কর্তৃক তার স্বামীকে প্রদত্ত সান্ত্বনার শিক্ষণীয় ঘটনাটি স্মর্তব্য। ঘটনাটি হ'ল এরূপ- তাদের একটি ছেলে মারা গেল। উম্মু সুলাইম পরিবারের সদস্যদের বললেন, আমি না বলা পর্যন্ত তাকে সন্তান মৃত্যুর কথা কেউ বলবে না। আবু ত্বালহা আসলে তার সামনে রাতের খাবার পেশ করলেন। তিনি পানাহার করলেন। এরপর সুসজ্জিত হয়ে নিজেকে স্বামীর কাছে পেশ করলেন। স্বামী আবু তালহা পরিতৃপ্ত হ'লে তাকে এ বলে সান্ত্বনা দেন যে, কোন সম্প্রদায় যদি কোন দম্পতির নিকট একটি আমানত রাখে, অতঃপর তারা তাদের আমানত ফেরত নিয়ে নেয়,তাহলে আপনি সেটা কোন দৃষ্টিতে দেখবেন?তাদের নিষেধ করার কোন অধিকার আপনার আছে কি?আবু তালহা উত্তর দিলেন না।
উম্মে সুলাইম বললেন, আপনার ছেলেকে সেই আমানত গণ্য করুন। তাকে হারানো পুণ্য বিবেচনা করুন। এ ঘটনা অবহিত হয়ে রাসূল (সা:) বলেন-আল্লাহ তা'আলা তোমাদের গত রাতের মিলনে বরকত দান করুন। এরপর উম্মে সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।[বুখারি হা/৫৪৭০]

অভিভাবকের অনুমতি

বিবাহের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি অতীব জরুরী। বিশেষ করে মেয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের অনুমতি একান্তভাবে আবশ্যক। কারণ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ হয় না। নবী করীম (সা:) বলেন- অভিভাবক ছাড়া কোনও বিবাহ নেই।[আবু দাউদ হা/২০৮৫]

তিনি আরও বলেন- যদি কোন নারী তার ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, তবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল। এইরূপ অবৈধ পন্থায় বিবাহিত নারীর সাথে সহবাস করলে তাকে মোহর দিতে হবে। কারণ পুরুষ মোহরের বিনিময়ে তার লজ্জাস্থানকে ব্যবহার করেছে। যদি ওলীগণ বিবাদ করেন, তবে যার ওলী নেই তার ওলী দেশের শাসক'।[আবু দাউদ হা/২০৮৩]

উল্লেখ্য যে, শারঈ অভিভাবক হ'ল পিতা, দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি। তবে পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ ওলী বা অভিভাবক হ'তে পারবে না। আবার কোন মহিলাও কারো ওলী হ'তে পারে না।[মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উছায়মীন,শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকিন ১২/৭৩পৃ:]

রাসূল (সা:) বলেন- কোনো নারী কোনো নারীর বিবাহ দিতে পারেনা এবং কোনো নারী নিজে বিবাহ করতে পারেনা।কোনো নারী নিজেই বিবাহ করলে সে ব্যভিচার বলে গণ্য হবে।[মিশকাত হা/৩১৩৭]

পাত্র-পাত্রীর সম্মতি ও সাক্ষাত

বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী বা বর-কনে হ'ল মূল। যারা সারা জীবন এক সাথে ঘর-সংসার করবে। সেকারণ বিবাহের পূর্বে তাদের সম্মতি থাকতে হবে। কোন অবস্থাতেই কোন ছেলে-মেয়ের অসম্মতিতে তাদেরকে বিবাহ করতে বাধ্য করা উচিত নয়।

আল্লাহ বলেন- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা বলপূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হবে'। (সুরা নিসা:১৯)

রাসূল (সা:) বলেছেন-বিবাহিতা মেয়েকে তার পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকে তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, তার অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ থাকাই হচ্ছে তার অনুমতি'।[মুসলিম হা/১৪১৯]

বিবাহের প্রস্তাব শোনার পর কুমারী মেয়ে চুপ থাকলে তার সম্মতি আছে বলে ধরে নিতে হবে। কিন্তু অকুমারী মহিলার ক্ষেত্রে সরাসরি সম্মতি নিতে হবে। রাসূল (সা:) বলেছেন, 'অকুমারী মেয়েরা নিজেদের ব্যাপারে ওলীর থেকে অধিক হকদার'।[মুসলিম হা/১৪২১]
অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা:) জনৈকা মহিলার সম্মতিবিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেন।[বুখারী হা/৫১৩৮]
 এছাড়াও কোন মেয়েকে অভিভাবক তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দিলে সে ইচ্ছা করলে বিবাহ বহাল রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে বিবাহ ভঙ্গ করতে পারে।[বুখারী হা/৬৯৪৫]

বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী উভয়ে একে অপরকে দেখে নেওয়া উচিত। যাতে পরস্পরের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি হয়। মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ) বলেন, আমি জনৈক নারীকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। রাসূল (সা:) আমাকে বললেন- তুমি কি তাকে দেখেছ? আমি বললাম, না।তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও।কেননা এতে তোমাদের উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।[মিশকাত হা/৩১০৭]

আমাদের সমাজে পাত্রী দেখার জন্য পাত্রের বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন মিলে ছোট-খাট একটি দল পাত্রীর বাড়ীতে যায়। তারা পাত্রীকে সবার সামনে বসিয়ে মাথার কাপড় সরিয়ে দাঁত বের করে, হাঁটিয়ে দেখে। এরপর সকলে মিলে বিভিন্ন প্রশ্ন করে ছোট-বড একটি ইন্টারভিউ নিয়ে ফেলে। কোন কোন ক্ষেত্রে হাসি-ঠাট্টা করতেও ছাড়ে না। সমাজে পাত্রী দেখার এই প্রচলিত পদ্ধতি শরী'আতসম্মত নয়। বিবাহের পূর্বে পাত্র ব্যতীত অন্যদের। এভাবে পাত্রী দেখা চোখের যেনার শামিল। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর পরহেজগারিতাকে না দেখে তার রূপ-লাবণ্য, বংশ ও সম্পদ দেখেই বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিম পাত্রের উচিত রূপ, বংশ ও সম্পদের চেয়ে পাত্রীর দ্বীনদারীকে প্রাধান্য দেয়া। পরিপূর্ণ দ্বীনদারী পাওয়া গেলে অন্য

গুণ কম হ'লেও দ্বীনদার মহিলাকেই বিবাহ করা উচিত, তাহ'লে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ হবে।

অনেক সময় পাত্রী দেখার নাম করে ছেলে-মেয়ের নির্জনে সময় কাটানো, পার্কে বসে আলাপ করা, হবু বধূকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (সা:) বলেন- কোনো পুরুষ যেন অপর মহিলার সাথে নিভৃতে অবস্থান না করে,কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ছাড়া সফর না করে।[বুখারী হা/৩০০৬]

কফু'র দিকে লক্ষ্য রাখা

দ্বীনদারী, পরহেযগারিতা, বংশমর্যাদা ও আর্থিক দিক সহ বিভিন্ন দিকে সমতার বিষয়টি লক্ষ্য রাখা যরূরী। বিশেষত দ্বীনদারীর ক্ষেত্রে সমতা না থাকলে পরিবারে অশান্তি বিরাজ করে। এজন্য রাসূল (সা:) বলেন- তোমরা ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে উত্তম মহিলা গ্রহণ করো এবং সমতা (কুফু) বিবচেনায় বিবাহ করো, আর বিবাহ দিতেও সমতার প্রতি লক্ষ্য রাখো'।[ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৮]

তবে বিবাহে সমতা হবে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে। যেমন আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহ:) বলেন- 'তবে জানা আবশ্যক যে, সমতা হচ্ছে কেবল দ্বীনদারী ও চরিত্রের ক্ষেত্রে'।[সিলসিলা সহিহ হা/১০৬৭-এর আলোচনা দ্র:]

সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিয়ে

পরিবার ও পারিবারিক জীবনের সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা রয়েছে ইসলামে। । বিবাহকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শরী'আতসিদ্ধ দাম্পত্য জীবনে জান্নাতের সুখ-শান্তির ছোয়া মেলে। তাই বিবাহ অনুষ্ঠান সুন্নাতী তরীকায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা, বেপর্দা, অশ্লীলতা, অপচয়, যৌতুক ইত্যাদি শরী'আত বিগর্হিত কাজ দেখা যায়। এতে বিবাহ নামক ইবাদতের ছওয়াব ও বরকত থেকে

বঞ্চিত হয় বর-কনে ও সংশ্লিষ্ট সকলে। আর তাদের দাম্পত্য জীবনে শুরু হয় ঝগড়া-বিবাদ, দ্বন্দ্ব-কলহ ও অশান্তি। অথচ বিবাহের মাধ্যমে ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয়।রাসূল (সা:) বলেন-
যে ব্যক্তি বিবাহ করল, সে অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করল। অতএব বাকী অর্ধেকে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে'।[মিশকাত হা/৩০৯৬]

বিবাহ পড়ানোর শারঈ পদ্ধতি হ'ল প্রথমে একজন বিবাহের খুৎবা পাঠ করবেন। এরপর মেয়ের পিতা বা অভিভাবক বরের সামনে মেয়ের পরিচয় ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করবেন। এসময় দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত থাকবেন। তখন বর সরবে 'কবুল' অথবা 'আমি গ্রহণ করলাম' বলবেন। এরূপ তিনবার বলা উত্তম।[বুখারী হা/৯৫]
শুধু বরকেই কবুল বলাতে হবে। কনের নিকট থেকে কনের অভিভাবক শুধু অনুমতি নিবেন। বর বোবা হ'লে সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতিতে ইশারা বা লেখার মাধ্যমেও বিবাহ সম্পন্ন হ'তে পারে।[শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকিন ১২/৪৪]

বিবাহের খুৎবা পাঠ করার পর বিবাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলবেন।
আমাদের সমাজে কবুল বলানোর জন্য কাজী বা যিনি বিবাহ পড়াবেন তিনি বরের অনুমতি নিয়ে দু'জন সাক্ষীসহ কনের নিকট চলে যান। কাজী গিয়ে বরের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে কনেকে কবুল বলতে বলেন। কবুল বলার পর কাযী ছাহেব বরের নিকট ফিরে আসেন এবং মেয়ের ঠিকানা ও মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করে মেয়েকে গ্রহণ করার জন্য কবুল বলতে বলেন। তিন বার কবুল বলার পর বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ানোর এই পদ্ধতি সঠিক নয়।

মোহর প্রদান

সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীকে মোহর প্রদান করা প্রত্যেক স্বামীর উপরে ফরয। আল্লাহ বলেন,'তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। (সুরা নিসা:৪)

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের মোহরানা ফরয হিসাবে প্রদান কর। (সুরা নিসা:২৪)

রাসূল (সা:) বলেছেন- বিবাহে সবচেয়ে বড় শর্ত যেটা তোমরা পূর্ণ করবে, সেটা হ'ল যা দ্বারা তোমরা লজ্জাস্থানকে হালাল কর'।[বুখারী হা/৫১৫১]
অর্থাৎ মোহর। মোহর নির্ধারণ করে তা পরিশোধ না করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূল (সা:) বলেন- যে কোন মহিলাকে নির্দিষ্ট মোহরের বিনিময়ে বিবাহ করল এই নিয়তে যে সে মোহর পরিশোধ করবে না, তাহ'লে সে ব্যভিচারী'।[বাযযর, সহিহ আত-তারগীব হা/১৮০৬]
মোহরানা কম হওয়ার প্রতি ইসলামে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। যাতে তা পরিশোধ করা সহজ হয়। রাসূল (সা:) বলেন-উত্তম মোহর হচ্ছে যা পরিশোধ করা সহজ। [বায়হাকী,সহিহুল জামে হা/৩২৭৯]
তিনি আরও বলেন- নিশ্চয়ই বরকত পূর্ণ মহিলা হলো যাকে প্রস্তাব দেওয়া সহজ, যার মোহর আদায় করা সহজ ও যার গর্ভাশয় (সন্তান ধারণে) সহজ হয়'।[মুসনাদে আহমাদ, সহিহুল জামে হা/২২৩৫]
সাহাবায়ে কেরাম বিবাহে অল্প মোহর নির্ধারণ করতেন। কারণ মোহর অধিক নির্ধারণের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।

আদর্শ দাম্পত্য জীবন যেমন হবে

ইসলামে দাম্পত্য জীবন শুধু একসাথে বসবাসের নাম নয়; বরং এটি ভালোবাসা, দয়া, দায়িত্ববোধ, সম্মান ও তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র সম্পর্ক। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী, শান্তির মাধ্যম ও জীবনসঙ্গী। একটি আদর্শ দাম্পত্য জীবন পরিবারে সুখ, সমাজে স্থিতিশীলতা এবং আখিরাতে সফলতার পথ তৈরি করে। কুরআন ও হাদিসে আদর্শ দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন দিক সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি হওয়া উচিত ভালোবাসা, মমতা ও পারস্পরিক সহানুভূতি। আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে "মাওয়াদ্দাহ" (ভালোবাসা) ও "রাহমাহ" (দয়া)-এর সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও; আর তিনি তোমাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন ভালোবাসা ও দয়া।"

[সূরা আর-রূম : ২১]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, আদর্শ দাম্পত্য জীবন কঠোরতা নয়; বরং ভালোবাসা ও শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে এবং পরস্পরের মর্যাদা রক্ষা করবে। ইসলাম পরিবারে নম্রতা ও সদাচরণের শিক্ষা দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন করো।"

[সূরা আন-নিসা : ১৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম।"

[তিরমিযি, হা/৩৮৯৫]

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, একজন মানুষের উত্তম চরিত্র তার পারিবারিক আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আদর্শ দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সহযোগী হবে। তারা সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকবে এবং সংসারের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে পালন করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।"

[সূরা আল-বাকারা : ১৮৭]

পোশাক যেমন মানুষকে আবৃত করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ও নিরাপত্তা দেয়, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের জন্য নিরাপত্তা, সম্মান ও সহায়তার উৎস।

দাম্পত্য জীবনে ভুল-ত্রুটি থাকতেই পারে। আদর্শ দাম্পত্য জীবনে রাগ, অহংকার ও প্রতিশোধের পরিবর্তে ক্ষমা ও ধৈর্য থাকা জরুরি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোনো মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে। তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য একটি স্বভাব সে পছন্দ করবে।"

[মুসলিম, হা/১৪৬৯

এই হাদিস দাম্পত্য জীবনে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়।

একটি আদর্শ পরিবার কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হবে। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে নেক কাজের প্রতি উৎসাহ দেবে এবং গুনাহ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।"

[সূরা আত-তাহরীম : ৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"আল্লাহ সেই পুরুষের প্রতি রহম করুন, যে রাতে উঠে সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকেও জাগায়..."

[আবু দাউদ, হা/১৩০৮]

এতে বোঝা যায়, আদর্শ দাম্পত্য জীবন শুধু দুনিয়াবি নয়; বরং আখিরাতমুখীও হবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। একে অপরের গোপন বিষয় রক্ষা করা এবং বিশ্বস্ত থাকা আদর্শ দাম্পত্য জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হবে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট গিয়ে তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে।"

[মুসলিম, হা/১৪৩৭]

৭. সন্তানদের উত্তমভাবে লালন-পালন

আদর্শ দাম্পত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সন্তানদের ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলা। সন্তানদের সুশিক্ষা ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা দেওয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”
[বুখারি, হাদিস : ৮৯৩]

আদর্শ দাম্পত্য জীবন হলো এমন জীবন, যা ভালোবাসা, সম্মান, দয়া, ধৈর্য, বিশ্বস্ততা ও আল্লাহভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বামী-স্ত্রী যখন কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে, তখন পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজও সুন্দর ও স্থিতিশীল হয়। তাই প্রত্যেক মুসলিম দম্পতির উচিত দাম্পত্য জীবনকে ইবাদত মনে করে পারস্পরিক অধিকার আদায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।

দাম্পত্য জীবনে বারাকাহ লাভের উপায়

আপনি ধরে নিবেন না যে, আপনার স্বামীর আপনার মনের কথা অক্ষরে অক্ষরে বুঝতে পারা উচিত। সাধারণত মেয়েদের সাইকোলজি এমন হয় যে, তারা ছোট ছোট ডিটেলস গুলো পর্যবেক্ষণ করে ভালো, কিন্তু ছেলেরা এত ছোট ছোট বিষয় খেয়াল করে স্ত্রীর মনের ভেতরে কি চলছে সেগুলো সব সময়ে বুঝে বুঝে রেসপন্স করবে— সাধারণত এটা তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য নয়।

যেমন: একটা বোনের গল্পের উদাহরণ দেই। তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে মার্কেটে গিয়েছে। হঠাৎ আপুর চোখ গেল এক গোলাপ বিক্রেতার হাতের দিকে। গোলাপ বিক্রেতা খুবই করুণ স্বরে সবার সামনে গিয়ে গোলাপ ধরছে আর বলছে, "একটা গোলাপ মাত্র ১০ টাকা. একটু নিয়ে নেন।" মানুষ তাকে তেমন পাত্তা দিচ্ছে না।

আপুকে দেখে যেন বিক্রেতা বুঝলো যে, আপু গোলাপ চাচ্ছে। তখন সে সরাসরি আপুর হাজবেন্ডের সামনে গিয়ে গোলাপ গুলো মেলে ধরল। আপুর হাজবেন্ড অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে যে দোকানে যাওয়ার কথা, সেই দোকানের দিকেই যাচ্ছিলেন।

মাঝপথে গোলাপ বিক্রেতা পথ ধরে দাঁড়ালে, তিনি কিছুটা বিরক্ত হলেন এবং হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলেন।

এই দৃশ্য দেখে আপুর ভুরু কুঁচকে গেল, মাথায় সাথে সাথে চিন্তা চলে আসলো, "দশ টাকা দিয়ে একটা গোলাপ আমাকে কিনে দিল না? তার কাছে আমার দাম ১০ টাকাও না?"

কিছুক্ষণ হাঁটার পর আপু বলে বসলো, "আপনি কেন আমাকে গোলাপ টা কিনে দিলেন না?"

আপুর হাজবেন্ড খুবই অবাক হয়ে বলল, "ওও তুমি কি আসলেই ওই গোলাপ চাও? আমি তো জানি না যে, তুমি গোলাপ চাচ্ছ এখন। তুমি চাইলে আমি এখনই তোমাকে কিনে দেই। পিছনে গিয়ে ডাক দিব ছেলেটাকে?
আর তুমি গোলাপ গুলোর দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখোনি? অনেক পুরান হয়ে গেছে, কালচে দাগ ধরে গেছে, গন্ধ নেই তেমন। আমি তোমাকে গোলাপ দিলে এমন পুরাতন ফুল কেন দেব? আমি তোমাকে আরো দাম দিয়ে সুন্দর একটা বড় তোড়া কিনে দিবো ইন শা আল্লাহ!"

এই কথা শুনে আপুর মন ঠান্ডা হল। এবং একটু আগে তার মাথায় কেমন কেমন নেগেটিভ চিন্তা আসছিল হাজবেন্ডকে নিয়ে, সেটা ভেবে বিব্রত বোধ করল।

এই ঘটনা থেকে একটা বড় শিক্ষা হচ্ছে: শুরুতে এই বোনের মনে কেন এত কষ্ট লাগল? তার নিজের ধরে নেওয়া নেগেটিভ চিন্তার জন্যই সে কষ্ট পাচ্ছিল। নিজের মনের ভুল ধারণা যে, "হাজব্যান্ড আমাকে একটা ফুল পর্যন্ত কিনে দিতে চায় না!"—এই চিন্তা করার জন্যই সে কষ্ট পাচ্ছিল। এখানে তার হাজবেন্ডের মাথায় এমন কোন চিন্তা কখনোই ছিল না বরং সে তার স্ত্রী কে আরো ভালো কিছু সব সময় দিতে চায়।

এবং ছোট ছোট বিষয় খেয়াল করার মত সময়, এনার্জি, মোটিভেশন ছেলেদের একটু কম থাকে। কারণ স্বভাবগত ভাবেই একজন দায়িত্বশীল স্বামীকে আরো অনেক বড়

বড় ক্রাইসিস দেখতে হয়, সংসারের হাল ধরতে হয়, অর্থনৈতিক বিষয়গুলো দেখতে হয়—তাই এটা সবসময় দোষ না যে, তারা ওয়াইফের চেহারা দেখেই কেন মনের কথা পড়তে পারছে না? মাঝে মাঝে ভেঙ্গে তাদের খুলে বলায় ক্ষতি নেই।

তাই এক্ষেত্রে সবাই যদি সহানুভূতিশীল হয় এবং বুঝতে চেষ্টা করে, "আমার চেহারা দেখেই হাসবেন্ড সব বুঝে ফেলবে এভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়নি। Mind-reading করতে না পারলেও সে আমাকে ভালবাসে। তাই মনে রাগ পুষে না রেখে, আমাদের বরং খোলাখুলি কমিউনিকেশন করা উচিত ছিল।" খোলাখুলি আলাপ করলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়ে যায় ইন শা আল্লাহ।

তাই দাম্পত্য জীবনকে সুস্থ ও বরকতপূর্ণ রাখতে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস:
(১) কখনো অযাচিত ধারণা করবেন না যে, আপনার হাজব্যান্ডের উচিত ছিল আপনার মনের কথা পড়ে ফেলার।

(২) এরকম ভাববেন না, যে একজন দায়িত্বশীল পুরুষ ইচ্ছা করে আপনাকে কষ্ট দিতে চাচ্ছে

(৩) কুরআনে আল্লাহ বলেছেন অতি-ধারনা কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাপ (সূরা হুজুরাত)। সেজন্য ওভার থিংকিং থেকে বিরত থেকে খোলাখুলি স্বামীর সাথে আলোচনা করুন। ভুল বোঝাবুঝি গুলো ক্লিয়ার করে নিন।

(৪) কথা/রাগ চাপিয়ে না রেখে খোলাখুলি ভদ্র ভাষায়, মাথা ঠান্ডা রেখে আলোচনা করার অভ্যাস করুন, আলাপ করার অভ্যাস করুন।

(৫) প্রত্যেকে যার যার জায়গা থেকে নিজের সীমাবদ্ধতা বোঝার চেষ্টা করুন এবং আল্লাহর কাছে দাম্পত্য জীবনে বরকত বৃদ্ধির জন্য সব সময় দুয়া করুন।

(৬) এই প্রত্যেকটা পদক্ষেপ আল্লাহর খুশির জন্য নিবেন, এমন নিয়ত শক্ত রাখুন অন্তরে। না হলে এগুলো করতে মেন্টালি ক্লান্ত লাগবে। আপনার বিয়ের পরিচর্যা করা আপনার ইবাদতের অংশ।

প্রথমত দুয়া, দুয়া এবং দুয়া। অনেকেই বলে, "বিয়ের ২-৩ বছর পরেই "হানিমুনের আমেজ" দূর হয়ে গেলেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে...।" এখন নিশ্চয়ই এই কথায় কিছু বাস্তবতা আছে। সেই সাথে দুয়া করার সময় আল্লাহর কাছে তো আমি চাইতেই পারি যে, "ইয়া রব্বুল আলামিন, সারা জীবন ধরে আপনি আমাদের বিয়ের "হানিমুনের আমেজ" বজায় রাখবেন, বরকত দান করবেন, এবং আমাদেরকে নেককার স্বামী স্ত্রী হওয়ার তৌফিক দিবেন যাদের উপর আপনি সন্তুষ্ট।" আমিন।
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে: সন্তানের সামনে কখনো স্বামী-স্ত্রীরা নিজেদের ঝগড়া, তর্ক এবং মতপার্থক্য গুলো খোলাখুলি ভাবে প্রকাশ করবেন না। আপনাদের স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে যতই ঝামেলা থাকুক, সেটা প্রাইভেটলি নিজেরা সমাধান করে নিন। বিশেষ করে সন্তানকে কিভাবে বড় করব? এই বিষয়গুলো নিয়ে যদি দুইজন দুই জায়গায় অবস্থান করেন, এবং সেটা আবার অভদ্র ভাষায় ঝগড়ার মাধ্যমে সন্তানের সামনে আসে, তাহলে সন্তান ভাববে "আমার মা-বাবা নিজেরাই ঠিক করতে পারে না যে, আমার জন্য কোনটা ভালো! আমি ওদের কারো কথা কেন শুনবো?" এই জিনিসটা অনেক ক্ষতি করে। তাই সচেতন থাকা জরুরি।

খুবই চমৎকারভাবে এই দুইটা বিষয়ের গাইডলাইন আমরা কুরআনের আয়াতে পাই। যে আয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ পরিবারের জন্য দুয়া করা শিখিয়েছেন। সেই সূরা ফুরকানের ৭৪ আয়াত পড়ে আমরা বেশি বেশি দুয়া করবো নিজের দাম্পত্য জীবনে বরকত বৃদ্ধির জন্য।

এই "চোখের শীতলকারী" একজন স্বামী অথবা স্ত্রী হতে পারার অর্থ অনেক গভীর! দুয়াটা শুধু মুখে মুখে লিপ সার্ভিস না হয়ে যদি গভীরতা বুঝে করা যায়, তাহলে সত্যিকার অর্থেই দাম্পত্য জীবনের মোড় ঘুরে যাবে ইন শা আল্লাহ।

আসুন আমরা এর গভীরতা বুঝার চেষ্টা করি,

সূরা ফুরকানের ৭৪ আয়াতের দুয়া:
"হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের স্বামী/স্ত্রীদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের সন্তানের পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা দান করুন, এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্যে আদর্শ হিসেবে কবুল করে নিন।"

এখানে আল্লাহর কাছে আমরা চাই, আল্লাহ যেন আমাদের পার্টনারদেরকে এবং আমাদের সন্তানদেরকে আমাদের জন্যে "চক্ষু শীতলতাকারী" বানিয়ে দেন। অর্থাৎ আমাদেরকে এমন স্বামী-স্ত্রী দান করেন, যেন তাদের দিকে তাকালেই আমাদের চোখ, মন এবং অন্তর শান্তিতে ঠান্তা হয়ে যায়।

দুয়ার ব্যাখ্যা: আরবের মরুভূমিতে প্রায়ই বালুর ঝড় হতো। সেই ঝড়ের মধ্যে পড়লে সবচেয়ে কষ্ট হতো যখন চোখে বালু ঢুকে যেত! প্রচন্ড ব্যথা লাগত চোখে, আর মরুভূমির গরম বালু লেগে চোখ গরম হয়ে যেত। এ অবস্থা থেকে বাঁচার জন্যে এমন কিছু লাগবে যা চোখকে শীতল করে দিতে পারে।

এই বিষয়টাই আল্লাহ তায়ালা অসম্ভব সুন্দর ভাবে এই দুয়ার সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। স্বামী স্ত্রীরা একজন আরেক জনের জন্যে এমনভাবে মানসিক, শারীরিক এবং আত্মিক শান্তির উৎস হবে, এমনভাবে সাপোর্ট করবে যেন দুনিয়ার ঝড় মোকাবেলা করতে করতে চোখ -মন যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে, তখন আমাদের স্পাউজরাই আমাদের ঠান্তা করবে।

ঘরের বাইরের ঝড় গুলো সামলে এসে দরজা বন্ধ করে যখন আমি ঘরের ভিতরে ঢুকবো, আমার স্ত্রীর চেহারাটা দেখেই আমার চোখ এবং অন্তর ঠান্ডা হয়ে যাবে— এমন একজন স্ত্রী হওয়ার কথা আমাদেরকে বলা হচ্ছে। এবং স্ত্রীর জীবনের সমস্ত ঝড়ের বিপরীতে শান্তি দানকারী একজন স্বামী হওয়ার কথা আমাদেরকে বলা হচ্ছে। আমরা কি তা করতে পারছি?

এমন হলে, বিবাহিত জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপ, ধৈর্য, কান্না, হাসি, একটু ছাড় দেওয়া এভাবে প্রতিটা পর্বই আল্লাহর ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে।

দুয়ার ২য় অংশটুকু আরো চমৎকার - শুধু একজন আরেকজনের অন্তর জুড়িয়ে দিয়েই বিয়ের শেষ না। এই বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ যেন এমন নেক সন্তান পৃথিবীতে রেখে যাবার তাওফিক দেন—যে দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করবে এবং আখিরাতে বাবা-মার জন্যে মুক্তি এবং পুরষ্কারের উসিলাহ হবে।

আমাদেরকে সন্তানদের জন্যে এমন লিডার হবার তাওফিক দিন, যেন আমরা কবরের নিচে মিশে যাবার পরেও সন্তান রা আমাদের জন্যে দুয়া করতে থাকে। এবং সেই দুয়া স্বামী স্ত্রীর জান্নাতে দাখিল হবার উসীলাহ হিসেবে কবুল হয়।

সেজন্য নিজেদের মধ্যে যতই মতপার্থক্য থাকুক না কেন, কখনোই সন্তানের সামনে ঝগড়াঝাঁটি করা উচিত নয়। এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ! আপনাদের স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে কোন সমস্যা তৈরি হলে, এটা প্রাইভেটলি নিজেরা সমাধান করে নিন। বাচ্চার তারবিয়াত নিয়ে দুইজন দুই জায়গায় অবস্থান করলে, সন্তান ভাববে "আমার মা-বাবা নিজেরাই ঠিক করতে পারে না, সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, আমি ওদের কথা কীভাবে শুনবো?"

তাই এই বিষয়টা খুব হিকমতের সাথে মাথায় রাখবেন, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া/মতপার্থক্য তর্ক গুলো যেন সন্তানের সামনে বাজে ভাবে এক্সপোস না হয়। তাহলে সেই সন্তানকে সুস্থ তারবিয়াহ এবং শিক্ষা দেয়া আরো কঠিন হবে।

দাম্পত্য জীবনে বরকত বৃদ্ধির কয়েকটি উপায় নিচে উল্লেখ করা হলো:
১| সবসময় আল্লাহকেই পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু বানাবেন। আপনি যদি শুধুমাত্র নিজের নাফসের জায়গা থেকে ভালবাসেন, তাহলে একটা পর্যায়ে গিয়ে ধরা খাবেন। নিজের মন মত কিছু না মিললেই অধৈর্য লাগবে, অস্থির লাগবে। কিন্তু আপনি যদি "আল্লাহর সন্তুষ্ট হবেন এই সম্পর্কের হক আদায় করলে"—এই চিন্তা করে ভালবাসেন, তাহলে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারবেন, অল্পতেই অধৈর্য হবেন না। এবং আল্লাহকে স্মরণ করলে আল্লাহ বরকত দিবে সংসারে এবং সম্পর্কে।

২| কথা শুরু করবেন "আমি" দিয়ে, "তুমি" দিয়ে শুরু করলে অপরপক্ষের মনে হয় তাকে অ্যাটাক করা হচ্ছে। অর্থাৎ এভাবে 'তুমি' দিয়ে শুরু করে বলবেন না যে, "তুমি এত অপরিচ্ছন্ন অগোছালো, এত কষ্ট করে গুছাই আর তুমি এসে সব এলোমেলো করো, ভালো লাগেনা!"

বরং আমি দিয়ে শুরু করুন, "আমার আসলে খুবই কষ্ট হয় যখন দেখি পরিশ্রম করে একটা গোছানো ঘর চোখের পলকে অগোছালো হয়ে গেল। বলো, আমরা দুজন মিলে কি করতে পারি এর সমাধান করতে?"

"আমি" দিয়ে শুরু করলে অপর পক্ষ সহজেই আক্রমণাত্মক বোধ করবে না বরং তার অন্তরে মায়া লাগবে।

৩| আপনার পার্টনারের ছোট ছোট দোষ ত্রুটি গুলো আপনার পরিবারের মা, বাবা/ ভাই / বোনকে কখনো বলে বেড়াবেন না। একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে, আপনার সাথে আপনার পার্টনারের সবকিছু ঠিক হয়ে গেছে। আপনি সেগুলো ভুলেও গেছেন! অথচ আপনার পরিবারের অন্তরে আপনার পার্টনারের প্রতি একটা নেগেটিভ মনোভাব রয়ে গেল, যেটা পরবর্তীতে আরো সমস্যার সৃষ্টি করবে।

আল্লাহ তো সূরা বাকারাহতে বলেছেন যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কাপড় হওয়ার কথা! কাপড় তো আমাদের শরীরের দাগ, দোষ ত্রুটি গুলো ঢেকে রাখে, এবং সুন্দর কাপড় আমাদেরকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে। ঠিক তেমন ভাবেই স্বামী স্ত্রী একে অপরের দোষ ত্রুটি ঢেকে রেখে একে অপরকে আল্লাহর খুশির জন্য আরো সৌন্দর্য্য মন্ডিত করবে।

৪| প্রকৃত গত দিক থেকে একজন পুরুষ সম্মান চায়। আল্লাহ রব্বুল আলামিন স্বামীকে আমাদের অভিভাবক বানিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ। সে জায়গা থেকে স্বামীকে মর্যাদা দিতে হবে। মাঝে মাঝে বলা দরকার, "আপনি যেহেতু আমার অভিভাবক, আপনিই বলেন কোনটা করলে ভালো হয়?"এতোটুকু বললে স্বামী মুখ ফুটে কিছু না বললেও, ভেতরে ভেতরে আপনার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। এবং

তাক্ওয়ার জায়গা একজন ভালো পুরুষ কখনোই এমন কোন সিদ্ধান্ত আপনার ওপর চাপিয়ে দেবেন না, যেটা আপনার দুনিয়া-আখিরাতের জন্য কষ্টকর। তার সিদ্ধান্তই ফাইনাল করা হলো এবং সেটা আপনাকে গুরুত্ব দিয়েই করা হলো আলহামদুলিল্লাহ।

৫| প্রকৃতগত দিক থেকে নারীরা ভালোবাসা চায়, একটু আদর-যত্ন চায়। এর জন্য সবপময় টাকাও খরচ করতে হয় না। আপনি যদি একটু নিয়মিত আপনার ওয়াইফের প্রশংসা করেন, সুন্দর একটা জামা পরলে তাকে সুন্দর বলবেন, শখ করে আপনার জন্য কিছু রান্না করলে সেটার প্রশংসা করবেন—এই ছোটখাটো বিষয়গুলো স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা আরো বৃদ্ধি করবে। দেখুন আমাদের প্রিয় রসূল ﷺ কাপের যে অংশে আঈশা(রা) মুখ লাগিয়ে খেয়েছেন, সেই জায়গাটা থেকেই তিনি খেলেন। এটা করার কি দরকার ছিল?

শ্রেষ্ঠ মহামানব এরকম একটা ছোট কাজ করে আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে, ছোট্ট আন্তরিক প্রচেষ্টায় দাম্পত্য জীবনে কত বরকত আসে!

৬| স্ত্রী অথবা স্বামী আপনারা কেউই কখনো কোন দাওয়াতে, অন্যান্য যৌথ পরিবারের সদস্যদের সামনে একে অপরকে সমালোচনা করবেন না। বলবেন না যে, "...আরে আমার হাসবেন্ড! সে তো এরকম ওরকম! .." .. "আমার ওয়াইফ তুমি অমুক ভাবীর মত হতে পারো না!—এগুলো কখনোই বরকত আনে না, পরিবেশ আর মনকে বিষাক্ত করে দেয়।

৭| দুইজন দুজনকে জান্নাতুল ফেরদৌসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে সচেষ্ট হবেন। আসলেই "টেনে নিয়ে যেতে হবে"। কারণ আপনার স্বামী স্ত্রী সেও তো মানুষ। তাই মাঝে মাঝে শয়তান তাকেও এসে যখন দুর্বল এবং অলস করে ফেলবে, এটা আপনার দায়িত্বে থাকবে আপনি তাকে সুন্দরভাবে আবারও আল্লাহর কথা মনে করিয়ে দিবেন। এবং বলবেন "আমি তো চাই জান্নাতে তুমি আমার স্বামী অথবা স্ত্রী হও!'

৮| স্বামী স্ত্রী আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তবে একজন আরেকজনকে নিয়ে অবসেস্ করবেন না। স্বামীর স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পূর্ণ হক আদায় করবেন। এর পাশাপাশি আপনার নিজের ছোটখাট হালাল আনন্দের যে বিষয়গুলো, নিজের শরীর-মনের যত্নের বিষয়গুলোকে অবহেলা করবেন না। যেমন: ইসলামিক বই পড়া, কয়েকটা হালাকায় অংশগ্রহণ করা, বান্ধবীদের বাসায় দাওয়াত দেয়া, দ্বীনি বোনদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা। উত্তম সহবাতের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখবেন বিয়ের পরেও। তাদেরকে কাট করবেন না।[শারিন সফি অদ্রিতা]

অধ্যায়-৩: স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব

পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ইসলামী অনুশাসন না থাকলে সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা, মায়া-মমতা এগুলো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। বরং দ্বন্দ্ব-কলহ, সন্দেহ-সংশয়, অমিল-অশান্তি বাসা বেঁধে পারিবারিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলবে। বিশেষ করে বর্তমান স্যাটেলাইটের যুগে অপসংস্কৃতির সয়লাবে আমাদের পারিবারিক জীবন হুমকির মুখে পতিত হয়েছে। স্যাটেলাইটে প্রদর্শিত উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা আমাদের পারিবারিক ও সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলছে। যেনা-ব্যভিচার, গুম-হত্যা, ছিনতাই-রাহাজানি, ধর্ষণ-অপহরণ ইত্যাদি এখন নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের পোশাক-পরিচ্ছদেও এসেছে উলঙ্গপনার ছাপ। বয়ফ্রেন্ড ও গার্লফ্রেন্ড, লিভ টুগেদার সংস্কৃতি এখন আমাদের দেশেও চালু - হ'তে শুরু করেছে। এগুলো বিজাতীয় কালচার। এর কারণে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। সেকারণ আমাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পরিবার থেকেই - সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আদব-কায়েদা ইত্যাদি শিক্ষা দিতে হবে। সাত বছর বয়সে ছালাতের শিক্ষা, দশ বছর বয়সে সালাত না পড়লে শাস্তি দেওয়া', কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদির প্রতি অধিক তাকীদ দিতে হবে। পরিবারকে আদব বা শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল (সা:) বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।তিনি বলেন- তাদের থেকে তোমার শিষ্টাচারের লাঠিকে উঠিয়ে নিও না'।[আবু দাউদ হা/৪৯৫]

উত্তম কথা ও উত্তম ব্যবহার

হাসিমুখে থাকা সাদাকার অন্তর্ভুক্ত।(তিরমিযী হা/১৯৭০)
তাই গোমড়ামুখে থাকা সমীচীন নয়। আর উত্তম কথা বলাও সাদাক্বা। এজন্য স্ত্রীর সাথে সর্বদা উত্তম কথা বলা উচিত। এতে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। রাসূল (সা:) বলেন-কল্যানমূলক কোন কাজকেই তুচ্ছ জ্ঞান করো না,যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও হয়।[মুসলিম হা/২৬২৬]

তিনি আরও বলেন-ভালো কাজে অবজ্ঞা প্রদর্শন করোনা। তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা নিঃসন্দেহে ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত। [আবু দাউদ হা/৪০৮৪]

উত্তম ব্যবহার দিয়ে অন্যকে জয় করা যায়, তার হৃদয়ে আসন করে নেওয়া যায়। এমনকি শত্রুকেও বশে আনা যায়।আল্লাহ বলেন- আর ভাল ও মন্দ সমান হ'তে পারে না। মন্দকে প্রতিহত কর তা দ্বারা যা উৎকৃষ্টতর, ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা রয়েছে সে যেন হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু' (হা-মীম সাজদাহ:৩৪)। তাই স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার ও আন্তরিক আচার-আচরণ করতে হবে। কেননা সে তার সকল স্বজন ছেড়ে কেবল স্বামীর কাছে আসে। আল্লাহ বলেন-তোমরা স্ত্রীদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ কর, (তবে হ'তে পারে) তোমরা এমন বস্তুকে অপছন্দ করছ, যার মধ্যে আল্লাহ প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন' (সুরা নিসা:১৯)। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন- তোমরা তাদের সাথে সুন্দর কথা বল। তাদের জন্য সাধ্যমত তোমাদের আচার ও আকৃতিকে সুন্দর কর, যেমন তোমরা তাদের থেকে পছন্দ কর'।[তাফসীর ইবনে কাসীর ২/২৪২পৃ:]
স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ ও ভাল ধারণা পোষণের জন্য রাসূল (সা:) সাহাবীদেরকে উপদেশ দিতেন। তিনি বলেন- কোনো মুমিন পুরুষ যেন কোন মুমিনা নারীকে শত্রু না ভাবে। কারণ নারীর কোন আচরণ অপছন্দ হ'লে কোন আচরণ পছন্দ হবেই'।[মুসলিম হা/১৪৬৯]
তিনি আরও বলেন-সে তোমার নিকটে তোমার উত্তম সাহচর্য পাওয়ার অধিকারী'।[তাবারানী,সহিহ হা/১৬৬]

স্ত্রীর সাথে একান্তে বসা ও খোশগল্প করা

অবসরে স্ত্রীর সাথে একান্তে বসে কিছু গল্প-গুজব করা, তার মনের কথা জানা-বুঝা, তার কোন চাহিদা থাকলে তা জেনে নিয়ে পূরণ করা স্বামীর - জন্য জরুরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন- নবী করীম (সা:) যখন (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করতেন, তখন আমি জাগ্রত হ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। অন্যথা তিনি শয্যাগ্রহণ

করতেন এবং ফজরের সালাতের জন্য মুয়াজ্জিন না ডাকা পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন'।[বুখারি হা/১১৬১]
অন্যত্র তিনি বলেন-রাসূল (সা:) যখন শেষ রাতে ছালাত শেষ করতেন, তখন লক্ষ্য করতেন আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন। আর ঘুমিয়ে থাকলে আমাকে জাগাতেন এবং দু'রাক'আত সালাত আদায় করে শুয়ে পড়তেন। অবশেষে মুয়াজ্জিন এসে যখন ফজরের সালাতের জন্য তাঁকে ডাকতেন, তখন তিনি উঠে হালকা করে দু'রাক'আত সালাত পড়ে ফরয সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[আবু দাউদ হা/১২৬২]

স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হওয়া

স্বামীদের করণীয় হচ্ছে নিজেকে সর্বদা পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি রাখা। কেননা অপরিচ্ছন্ন থাকা ও অপরিষ্কার পোশাক পরিধান করা স্ত্রীরা পছন্দ করে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন-আমি আমার স্ত্রীর জন্য সুসজ্জিত হ'তে ঐরূপ পছন্দ করি যেভাবে আমার জন্য তার সুসজ্জিত হওয়া পছন্দ করি'।[তাফসীর কুরতুবী ৫/৯৭]

বাড়িতে প্রবেশ করে স্ত্রীকে সালাম দেওয়া

সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায়। সেজন্য বাড়ী থেকে বের হ'তে ও বাড়ীতে প্রবেশকালে বাড়ীর অধিবাসী বিশেষত স্ত্রীকে সালাম দিতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সা:) আমাকে বললেন- হে বৎস! তুমি যখন তোমার পরিবার-পরিজনের নিকটে যাও, তখন সালাম দিও। তাতে তোমার ও তোমার পরিবার-পরিজনের কল্যাণ হবে'।[তিরমিযী হা/২৬৯৮]

তিনি আরো বলেন-তিন ব্যক্তি আল্লাহর যিম্মায় থাকে। যদি তারা বেঁচে থাকে তাহ'লে রিযক প্রাপ্ত হয় এবং তা যথেষ্ট হয়। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তাহ'লে জান্নাতে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি বাড়ীতে প্রবেশ করে বাড়ীর লোকজনকে সালাম দেয়, সে

আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়, সে আল্লাহর যিম্মায়। যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, সে আল্লাহর জিম্মায়'।[আবু দাউদ হা/২৪৯৪]

স্ত্রী অসুস্থ হলে সেবা করা

স্ত্রী অসুস্থ বা রোগাক্রান্ত হ'লে সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করা স্বামীর কর্তব্য। ইবনু উমার (রাঃ) বলেন, উসমান (রাঃ) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা তাঁর স্ত্রী আল্লাহর রাসূল (সা:)-এর কন্যা অসুস্থ ছিলেন। তখন নবী করীম (সা:) তাঁকে বললেন- বদর যুদ্ধে যোগদানকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব ও (গনীমতের) অংশ তুমি পাবে'।[বুখারী হা/৩১৩০]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সা:) তাঁর কোন এক স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান, ডান হাত তাঁর শরীরে বুলিয়ে দেন এবং বলেন-' কষ্ট দূর কর হে মানুষের প্রতিপালক! আরোগ্য দান কর। তুমিই আরোগ্য দানকারী। কোন আরোগ্য নেই তোমার দেওয়া আরোগ্য ব্যতীত; যা কোন রোগীকে ধোঁকা দেয় না'।[বুখারী হা/৫৭৫০]

মানুষ অসুস্থ হলে সে আপনজনের সান্নিধ্য ও সাহচর্য কামনা করে।তাই স্ত্রীর অসুস্থতায় সাধ্যমত তার পাশে থাকা,তার সেবা করা এবং তার জন্য দু'আ করা স্বামীর জন্য করণীয়।

স্ত্রীকে সহযোগিতা করা

স্ত্রীকে পারিবারিক কাজে সহযোগিতা করা স্বামীর জন্য একান্ত করণীয়। বিশেষত সে অসুস্থ হ'লে বা তার পক্ষে কোন কাজ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়লে তাকে সাধ্যমত সহযোগিতা করা জরুরী। আয়েশা (রাঃ) বলেন-তিনি পরিবারের কাজ করতেন, যখন সালাতের সময় হ'ত তখন তিনি সালাতের জন্য বের হয়ে যেতেন'।[বুখারী হা/৬৭৬]

আয়েশা (রা:) আরো বলেন-তিনি মানুষের মধ্যেকার একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় কাপড় সেলাই করতেন, বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজে করতেন'।[তিরমিযী হা/৩৪৩]
অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেন-তিনি নিজের কাপড় সেলাই করতেন, স্বীয় জুতায় তালি লাগাতেন এবং এবং অন্যান্য পুরুষের ন্যায় বাড়ীর কাজ করতেন'।[আহমাদ হা/২৪৩৮২]

স্ত্রীর ভরনপোষণ ও চাহিদা পূরণ

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিছু হক বা অধিকার আছে, যেগুলি আদায় করা স্বামীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। এই অধিকারগুলি যথাযথভাবে প্রদান করলে স্বামীর প্রতি স্ত্রী যেমন অনুগত হয়, তেমনি তার প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা-মহব্বত অটুট থাকে।

স্বামীর উপরে কর্তব্য হচ্ছে সকল চাহিদা পূরণ করা।রাসূল (সা:) বলেন- তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে,তোমার উপর তোমার চোখের হক আছে ও তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক আছে।[বুখারী হা/১৯৭৫]
আবু দারদার হাদিসে আছে- তোমার উপর তোমার দেহের হক আছে,তোমার রবের হক আছে,মেহমানের হক আছে এবং তোমার পরিবারের হক আছে।অতএব প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান কর।[বুখারী হা/৬১৩৯]

অন্যদিকে স্ত্রীর ভরণ-পোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বামীর। আল্লাহ বলেন- সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে। আর যার রিজিক সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন তার অতিরিক্ত বোঝা তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন(তালাক্ব ৬৫/৭)। হাকীম বিন মু'আবিয়া আল-কুশাইরী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোষাক পরিধান করলে তাকেও পোষাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না,

তাকে গালমন্দ করবে না। আর তাকে পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে'।[আবু দাউদ হা/২১৪২]
কারো সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সে যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করতে কৃপণতা করে তাহ'লে সে পাপী হবে। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,কেউ পাপী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার উপর নির্ভরশীলদের রিযিক নষ্ট করে'। [আবু দাউদ হা/১৬৯২]

রাসূল (সা:) বলেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক দায়িতুশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সে তা সংরক্ষণ করেছে, না তাতে অবহেলা করেছে? এমনকি পুরুষকে তার স্ত্রী (পরিবার-পরিজন) সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন'।[সহিহুল জামে হা/১৭৭৪]পক্ষান্তরে পরিবারের জন্য খরচকৃত অর্থের ফযীলত অনেক বেশী। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন-উত্তম হ'ল ঐ দীনার যা কোন ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে'।[মুসলিম হা/৯৯৪]
অন্যত্র তিনি বলেন- এক দীনার যা তুমি আল্লাহর পথে খরচ কর। এক দীনার দরিদ্রদের জন্য, এক দীনার দাসমুক্তির জন্য এবং এক দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক সওয়াব লাভ হয় ঐ দীনারে, যা তুমি তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর'।[মুসলিম হা/৯৯৫]
আর পরিবারের জন্য খরচ করা অর্থ সাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্বামী সাধ্যমত স্ত্রীকে পোষাক-পরিচ্ছদ দান করবে। রাসূল (সা:) বলেন-আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে'।[তিরমিযী হা/১১৬৩]
অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, সমাজে এমন অনেক দায়িত্বহীন মানুষ আছে, যারা নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে ভাল ও মানসম্মত পোষাক কিনে দেয় না। অথচ নিজে মূল্যবান পোষাক পরিধান করে।

স্ত্রীকে গুরুত্ব দেওয়া ও পরামর্শ করা

স্বামী-স্ত্রী দু'জনের মাধ্যমে একটি সুখী-সুন্দর পরিবার গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কারো অবদান কম নয়। কাউকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই। কারণ স্বামী বাইরের কাজ করে আর স্ত্রী বাড়ীর ভিতরের কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। তাই পরিবারের যে কোন কাজে তার সাথে পরামর্শ করা ও সঠিক হ'লে সে পরামর্শ মূল্যায়ন করা উচিত। আল্লাহ বলেন-আর জরুরী বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ কর' (আলে ইমরান ৩/১৫৯)। রাসূলুল্লাহ (সা:) অহী নাযিলের পরে খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন(মুসলিম হা/১৬০) এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে উম্মু সালামা (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন।(বুখারী হা/২৭৩২)

স্ত্রীকে দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেওয়া

স্বামীর অন্যতম কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া। যার মাধ্যমে তাদের উভয়ের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুন্দর ও কল্যাণময় হবে। রাসূল (ছাঃ) মালেক বিন হুওয়াইরিছ ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মধ্যে বসবাস কর। আর তাদেরকে (দ্বীন) শিক্ষা দাও এবং (সৎ কাজের) নির্দেশ দাও'।[বুখারি হা/৬৩১]

ইবাদতের বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যরূরী। এজন্য নিজ সুতরাং স্ত্রীকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়, ইসলাম ও ঈমানের রুকনসমূহ, বাড়ীতে সাপ্তাহিক পারিবারিক তা'লীমের ব্যবস্থা করা উচিত। নিজে তা করতে না পারলে যেখানে উপরোক্ত শিক্ষা দেওয়া হয় সেখানে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া বা যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া উচিত। যেমন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কর্তৃক পরিচালিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যায়।

স্ত্রীকে দ্বীনের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান

প্রত্যেক স্বামীর জন্য কর্তব্য হ'ল স্বীয় স্ত্রীকে দ্বীনী কাজের নির্দেশ দেওয়া। যাতে তারা তা যথাসাধ্য পালন করে। আল্লাহ বলেন, 'আর তুমি তোমার পরিবারকে ছালাতের আদেশ দাও এবং তুমি এর উপর অবিচল থাক' (সুরা ত্ব-হা:১৩২)। রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে তথা ইবাদতের নির্দেশ দিতেন। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, এক রাত্রে রাসূল (সা:) ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় জাগ্রত হয়ে বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ কতইনা ধনভাণ্ডার অবতীর্ণ করেছেন এবং কতইনা ফিৎনা নাযিল হয়েছে! কে আছে যে হুজরাবাসিনীদেরকে জাগিয়ে দেবে? যেন তারা ছালাত আদায় করে। এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রীদেরকে উদ্দেশ্য করেছিলেন। তিনি আরো বললেন, দুনিয়ার বহু বস্ত্র পরিহিতা পরকালে উলঙ্গ থাকবে'।[বুখারী হা/৭০৬৯]

অধ্যায়-৪: স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

স্বামীর আনুগত্য

ইসলামে স্বামীর বৈধ আনুগত্য করা স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তবে এই আনুগত্য শুধুমাত্র শরীয়তসম্মত ও ন্যায়সঙ্গত বিষয়ে প্রযোজ্য। আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে কারো আনুগত্য করা বৈধ নয়।

ইসলামে পরিবারকে শান্তি ও শৃঙ্খলার ভিত্তির উপর গড়ে তোলার জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্ত্রীর জন্য স্বামীর বৈধ নির্দেশ মান্য করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।
আল্লাহ তাআলা বলেন:
“পুরুষরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।”
[সূরা আন-নিসা: ৩৪]
আরও এসেছে:
“সৎ নারীরা অনুগতা এবং আল্লাহ যা সংরক্ষণ করতে বলেছেন, তারা স্বামীর অনুপস্থিতিতেও তা সংরক্ষণ করে।”
[সূরা আন-নিসা: ৩৪]
রাসূল ﷺ বলেছেন:
“যদি আমি কাউকে অন্য কাউকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম সে যেন তার স্বামীকে সিজদা করে।”
[তিরমিযি, হা/১১৫৯]
অন্য হাদিসে এসেছে:
“যে নারী পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমযানের রোজা রাখে, নিজের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে বলা হবে: তুমি জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ কর।”
[আহমদ, হাদিস: ১৬৬১]

তবে ইসলামে স্বামীর আনুগত্য অন্ধভাবে নয়। যদি স্বামী আল্লাহর অবাধ্যতার কোনো নির্দেশ দেয়, তাহলে তা মানা যাবে না। রাসূল ﷺ বলেছেন:
“সৃষ্টির আনুগত্যে স্রষ্টার অবাধ্যতা নেই।”
[আহমদ, হা/১০৯৮]
অতএব, ইসলামে স্বামীর আনুগত্য বলতে বোঝায়—ভালোবাসা, সম্মান, সহযোগিতা ও শরীয়তসম্মত বিষয়ে স্বামীর কথা মান্য করা। এর মাধ্যমে পরিবারে শান্তি, সৌহার্দ্য ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

ধৈর্যশীল হওয়া

স্বামী প্রদত্ত কষ্ট ও তার দুর্ব্যবহারে ধৈর্য ধারণ করা এবং একে ছওয়াবের কারণ মনে করা উচিত। তার পক্ষ থেকে খারাপ আচরণ পেলেও তা সহ্য করা এবং তার শয্যা পরিত্যাগ না করা স্ত্রীর জন্য কর্তব্য। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে আর স্ত্রী অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহ'লে ফেরেশতাগণ এরূপ স্ত্রীর উপর সকাল পর্যন্ত লা'নত করতে থাকে'। [বুখারী হা/৩২৩৭]

অন্যের সামনে নিজেকে প্রদর্শন না করা

স্ত্রীর যাবতীয় সাজসজ্জা ও শোভা-সৌন্দর্য কেবল স্বামীর জন্য হবে। অন্যের জন্য তার সৌন্দর্য প্রকাশ ও প্রদর্শন করা বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন,আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে তাদের স্বামীর নিকটে ব্যতীত' (সুরা নূর:৩১)।

রাসূল (সা:)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল-কোন নারী উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যে স্বামীকে আনন্দিত করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়'।
(নাসাঈ হা/৩২৩১)

সুতরাং স্বামী ব্যতীত অন্য কারো জন্য অঙ্গসজ্জা করা ও তা প্রদর্শন করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে এ রূপ-লাবণ্য ও সাজসজ্জা অন্যের জন্য করা হ'লে সেটা তার অকল্যাণের কারণ হবে।

রাসূল (সা:) বলেন,যে নারী সুগন্ধি ব্যবহার করল অতঃপর লোকদের পাশ দিয়ে এ উদ্দেশ্যে অতিক্রম করল যে, তারা যেন তার সুঘ্রাণ পায়, তাহ'লে সে ব্যভিচারিণী'। [নাসাঈ হা/৫১২৬]

আদর্শ নারীর সদা চিন্তা স্বামীর মনোতুষ্টি। কারণ তার আনন্দেই স্ত্রীর সুখ। স্বামী সুখী না হ'লে স্ত্রী নিজের সুখ কল্পনাই করতে পারে না। তাই স্বামীর প্রয়োজনের প্রতি সদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেমন স্বামী বাইরে থেকে আসলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার সামনে পানি, শরবত পেশ করা, তার প্রয়োজনীয় জিনিস এগিয়ে দেওয়া, বৈদ্যুতিক পাখা না থাকলে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করা ইত্যাদি আদর্শ স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া স্বামী সালাম দিয়ে যখন বাড়িতে প্রবেশ করে, তখন হাসিমুখে স্বামীর সালামের উত্তর দেওয়া উচিত।

সাধারণত স্ত্রী স্বামীর জন্য সাজসজ্জা করে ফুটন্ত গোলাপ সদৃশ হয়ে থাকবে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতায়, সাজসজ্জা ও বেশভূষায় স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সৌন্দর্য ও সৌরভে ভরা গোলাপের দিকে এক পলক তাকিয়ে যেমন মন-প্রাণ আকৃষ্ট হয়, স্বামীর মনও তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তেমনি প্রফুল্ল হবে। স্ত্রীর মাঝে সৎগুণাবলী থাকলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মধুর সম্পর্ক থাকলে, কোন নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রয়োজনই হবে না।

উল্লেখ্য যে, যে স্বামী তার স্ত্রীর প্রগাঢ় ভালোবাসা পায়, বিপদে সান্ত্বনা, কষ্টে সেবা-যত্ন পায়, রাগ-অনুরাগ বা অভিমান করলে যার স্ত্রী তার অভিমান ভাঙ্গাতে ব্যাকুল থাকে সেইতো সৌভাগ্যবান। পিতা-মাতার দো'আ ও স্ত্রীর অকৃত্রিম প্রেমের বাহুবন্ধনেই তো রয়েছে স্বামীর প্রকৃত পৌরুষ। এমন স্ত্রী না হ'লে পুরুষের জীবন বৃথা।

লজ্জাস্থানের হেফাজত করা

স্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য হ'ল তার লজ্জাস্থান হেফাযত করা। অর্থাৎ ব্যভিচারের পথ পরিহার করা। আল্লাহ বলেন-'অতএব সতী-সাধবী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' (নিসা ৪/৩৪)।রাসূল (সা:) বলেন-'উত্তম স্ত্রী সে যার দিকে তুমি তাকালে তোমাকে আনন্দিত করে, তুমি নির্দেশ দিলে তা পালন করে, তোমার অনুপিস্থিতিতে তার নিজেকে ও তোমার সম্পদ হেফাযত করে'। [ত্বাবারাণী হা/৩২৯৯]

রাসূল (সা:) বলেন-'আমি কি তোমাকে মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হ'ল, নেককার স্ত্রী। সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) দিকে তাকালে স্ত্রী তাকে আনন্দ দেয়, তাকে কোন নির্দেশ দিলে সে তা মেনে নেয় এবং সে যখন তার থেকে অনুপস্থিত থাকে, তখন সে তার সতীত্বের হেফাযত করে'। [আবু দাউদ হা/১৬৬৪]

এর সাথে নিম্নোক্ত কাজগুলি করা জরুরী।

১/ স্বামীর অনুপস্থিতিতে গায়ের মাহরাম পুরুষকে বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

২/পরিবারে নারী ও পুরুষের মাঝে পর্দার ব্যবস্থা থাকা।

৩/পরিচারক ও গাড়ী চালকদের থেকে সাবধান থাকা।

৪/ হিজড়াদের বাড়ীতে প্রবেশ করতে না দেওয়া।

৫/ টেলিফোন ও মোবাইলের ক্ষতি থেকে সাবধান থাকা।

৬/বিধর্মীদের ধর্মীয় প্রতীক ও দেব-দেবীর প্রতীক পরিহার করা।

৭/সকল প্রকার প্রাণীর ছবি ও মূর্তি বাড়ীতে না রাখা।

৮/যাবতীয় নেশাদ্রব্য থেকে বাড়ীকে মুক্ত রাখা।

৯/কোন কুকুর বাড়ীতে না রাখা।

১০/বাদ্যযন্ত্র ও অশ্লীল গান-বাজনা পরিহার করা।

১১/ বাড়ীর ভিতর-বাহির পরিচ্ছন্ন রাখা। [মুহাম্মদ সালেহ আন-মুনাজ্জিদ]

স্বামীর রাগের সময় স্ত্রী বিনম্র হওয়া

কখনও কোন কারণে স্বামী রাগান্বিত হ'লে স্ত্রী নীরব থাকবে ও নম্রতা অবলম্বন করবে। যে আদর-সোহাগ করে, তার শাসন করারও অধিকার আছে। আর এ শাসন স্ত্রীকে মাথা পেতে মেনে নিতে হয়। ভুল হ'লে ক্ষমা চাইবে। স্বামী যেহেতু মর্যাদায় বড়, সেহেতু তার কাছে ক্ষমা চাওয়া অপমানের নয়; বরং এতে মান-সম্মান বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পরিণাম কখনও ভাল হয় না। সুতরাং স্বামীর রাগের আগুনকে গর্ব-অহংকার ও ঔদ্ধত্যের ফুৎকারে প্রজ্বলিত না করে বিনয়ের পানি দিয়ে নির্বাপিত করা উচিত। নবী করীম (সা:) বলেন- তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রেমময়ী, সন্তানদানকারিণী, ভুল করে বার বার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাযী (ঠাণ্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাব না'। [বাইহাক্বী হা/৮২৩৫৮]
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে শয়তান বড় তৎপর। সে সমুদ্রের উপর নিজ সিংহাসন পেতে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে তার বাহিনী পাঠিয়ে দেয়। সবচেয়ে যে বড় ফিৎনা সৃষ্টি করতে পারে সেই হয় তার অধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত। কে কি করেছে তার হিসাব নেয় ইবলীস। প্রত্যেকে এসে বলে, আমি এটা করেছি, আমি ওটা করেছি (চুরি, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি সংঘটন করেছি)। কিন্তু ইবলীস বলে, কিছুই করনি! অতঃপর যখন একজন বলে, আমি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে রাগারাগি সৃষ্টি করে উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ছেড়েছি। তখন শয়তান উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বলে, হ্যাঁ, তুমিই কাজের কাজ করেছ! [মুসলিম হা/২৮১৩]
সুতরাং রাগের সময় শয়তানকে সহায়তা ও তুষ্ট করা কোন মুসলিম দম্পতির কাজ নয়।

স্বামীর অপছন্দনীয় কাউকে বাড়িতে প্রবেশ করতে না দেয়া

স্বামী অপছন্দ করে এমন কোন লোককে বাড়ীতে বা নিজের কাছে প্রবেশ করতে দেওয়া স্ত্রীর জন্য উচিত নয়। রাসূল (সা:) বলেন-তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার

এই যে,তোমরা যাদেরকে পছন্দ কর না তারা যেন সেসব লোককে দিয়ে তোমাদের বিছানা না মাড়ায়।(মুসলিম হা/১২১৮)

স্বামীকে সম্মান করা ও তার অনুগত থাকা

স্ত্রীর কাছে স্বামী অতি সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। তার সম্মানের কথা হাদিসে এভাবে উল্লিখিত হয়েছে-
যদি আমি কাউকে নির্দেশ দিতাম আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করার, তাহ'লে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তাঁর কসম! কোন নারী তার প্রতিপালকের হক ততক্ষণ পর্যন্ত আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর হক আদায় করেছে। সওয়ারীর পিঠে থাকলেও স্বামী যদি তার সাথে মিলন করতে চায়, তবে সে বাধা দিতে পারবে না'। [ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৩]
অন্যত্র তিনি বলেন-
স্ত্রীর কাছে স্বামীর এরূপ হক আছে যে, স্ত্রী যদি স্বামীর দেহের ঘা চেটেও থাকে তবুও সে তার যথার্থ হক আদায় করতে পারবে না'। [সহিহুল জামে হা/৩১৪৮]

তাই স্বামীর শরী'আতসম্মত সকল কাজে সহযোগিতা করা এবং তার বৈধ নির্দেশ মেনে নেওয়া স্ত্রীর জন্য আবশ্যক। আল্লাহ বলেন-'অতএব সতী-সাধবী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' (সুরা নিসা: ৩৪)। আর স্বামীর আনুগত্যে অশেষ সওয়াব।
রয়েছে। রাসূল (সা:) বলেন-মহিলা তার পাঁচ ওয়াক্তের ছালাত আদায় করলে, রামাযানের ছিয়াম পালন করলে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে'। [মিশকাত হা/৩২৫৪]

অধ্যায়-৫:স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক

পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা

স্ত্রী ও সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা বজায় রাখা পরিবারে সম্প্রীতি-সদ্ভাব বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এজন্য রাসূল (সা:) জাবের (রাঃ)-কে বলেনতবে কোন তরুণী (কুমারী) কেন নয় যে, তুমি তার সাথে আমোদ-স্ফূর্তি করতে, সেও তোমার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করত তুমি তার সাথে হাস্য-রস করতে, সেও তোমার সঙ্গে হাস্য-রস করত'। [বুখারী হা/৫৩৬৭]

অন্যত্র তিনি বলেন,যে বস্তুতে আল্লাহ্ যিকির উল্লেখ করা হয় না তা একটিনিরর্থক ও কৌতুক। কিন্তু চারটি বস্তু এমন রয়েছে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়-

(১) পুরুষের স্বীয় স্ত্রীর সাথে আমোদ-ফুর্তি বা হাস্য-রস করা

(২) কারো ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া

(৩) দু'টিলার মধ্যস্থল দিয়ে ঘোড়া দৌড়ানো

(৪) কাউকে সাঁতার শিক্ষা দেওয়া'। [নাসাউ হা/৪৫৩৪]

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়। যে, স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা করা ও মাঝে-মধ্যে বৈধ খেলাধূলা করায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্কের সেতুবন্ধন আরো সুদৃঢ় ও মযবৃত হয়। পক্ষান্তরে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বত না থাকলে সংসারে সুখ-শান্তি থাকে না; পরিবার পরিণত হয় অশান্তির আকরে।

সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা

সত্যবাদিতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র একটি মূল্যবোধ। যেকোনো ক্ষেত্রে সাফল্যের একটি মৌলিক ভিত্তি হলো সত্যবাদিতা। এর সাথে ঈমানের দৃঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। সত্যবাদিতা সকলের সাফল্য নিশ্চিত করে। কেউ মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না, তার ওপর নির্ভর করে ভরসা পায় না।

সত্যবাদিতা প্রসঙ্গে আমাদের নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা সত্যবাদী হও। কারণ সত্যবাদিতা ন্যায়পরায়ণতার দিকে পরিচালিত করে। অবশ্যই

ন্যায়পরায়ণতা জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। একজন আল্লাহভীরু বান্দা সকল পরিস্থিতিতেই সত্যের ওপর অবিচল থাকলে, একসময় সে আল্লাহর নিকট সিদ্দিক হিসেবে গণ্য হয়।

তোমরা মিথ্যার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। মিথ্যা আমাদের পাপের পথে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়। মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে একপর্যায়ে সে আল্লাহ তাআলার কাছে কাজ্জাব বা মিথ্যাবাদী হিসেবে গণ্য হয়। [বুখারী হা/৬০৯৪]

সত্যবাদিতার জন্য দারুণ একটি সুখবর হচ্ছে একজন সত্যবাদী ব্যক্তি সবসময় ন্যায়পরায়ণতার দিকে ধাবিত হয়। 'ন্যায়পরায়ণতা' একটি বিশাল শব্দ; এর ভেতর সব ধরনের ভালো কাজ অন্তর্ভুক্ত। একজন ন্যায়পর মানুষ সর্বদা হিদায়াতের পথে চলে। যদিও এই হাদিসটি সত্যবাদীর প্রশংসা করতেই বলা হয়েছে, তবু এ থেকে এটাও পরিষ্কার বোঝা যায়, একজন সত্যবাদী ব্যক্তি সর্বদা নিজের নফসের সাথে লড়াই করে। কারণ সত্যবাদী হয়ে ওঠার জন্য তাকে অবিরত পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে পারবে না, তার পক্ষে সর্বাবস্থায় সত্যবাদী হয়ে থাকাও সম্ভব হবে না। বিশেষ করে, এমন অনেক বিষয় ও পরিস্থিতি আছে যা তাকে মিথ্যা বলতে বাধ্য করে।

হাদিসে এটাও রয়েছে যে, মিথ্যাবাদিতা অনৈতিকতার পথে টেনে নেয়। আর এই অনৈতিকতা জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়। [বুখারী হা/৬০৯৪]

আল্লাহ ও তাঁর বান্দাকে ন্যূনতম ভয় না পেয়ে কেউ যদি কোনো সুবিধা অর্জনের প্রমাণ করতে পারে এবং যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য জন্য কেবল একবার মিথ্যা বলে নিজের দোষ ঢাকতে পারে, ভুলগুলোকে যুক্তিসংগত হিসেবে উপস্থাপন করে, তারা যেন চিরকালের জন্য মিথ্যাবাদীদের দলে নিজেদের নাম লেখাল।

তাই আমরা আমাদের পরিবারগুলোতে সত্যবাদিতা ও সততার পরিচর্যা করে যাব। পারিবারিক আলোচনায় বড়রা যেন একে অন্যের সাথে সত্য কথা বলে। তাদের

দেখে বাড়ির ছোটরাও সত্য বলাকে যথার্থ মূল্যায়ন করা শিখবে এবং মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে জানবে। বড়দের উচিত কথাবার্তায় আরো যত্নশীল হওয়া। রাগের মাথায় অথবা ঠাট্টা করে এমন কোনো কথা কখনোই বলা উচিত নয়, যে কথায় অন্যদের মন ভেঙে যায়, সম্পর্কে ফাটল ধরে অথবা তাদের মধ্যকার কোনো চক্তিভঙ্গ হয়। এতে বাচ্চারা মনে করবে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কগুলো খুব ঠুনকো। মানুষে মানুষে যে চুক্তি করে, তার কোনো গুরুত্ব নেই। এই চুক্তি ভাঙা যায় সহজেই।

একটি মুসলিম পরিবারে মাঝে মাঝে পারিবারিক আলোচনার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যেখানে সত্য বলার ফায়দা আর মিথ্যার ধ্বংস নিয়ে আলোচনা করা হয়। গল্পে গল্পে আলোচনার মাধ্যমে খুব সহজেই সন্তানদেরকে সত্য বলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা যায়। একদিন পারিবারিক হালাকায় (বৈঠকে) বাবা তার সন্তানদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে একটি উদাহরণ দিলেন- 'মনে করো, তুমি তোমার বন্ধুর বাসায় গিয়েছ, বন্ধুর খোঁজখবর নেওয়ার জন্য। তখন সেই বাসার কেউ একজন তোমাকে বলল, সে তার মামার বাসায় বেড়াতে গেছে। তাহলে তার কথায় বোঝা যায়, সে নিশ্চিত হয়েই কথাটি বলেছে। কিন্তু কেউ যদি নিশ্চিত না হয়, তখন তার বলা উচিত, "আমার মনে হয়, সে কোথাও বেড়াতে গিয়েছে।" কিংবা এভাবে বলা যেতে পারে, "কে যেন বলল, সে তার মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই।" কারণ মানুষের কথার খুব গুরুত্ব ও প্রভাব রয়েছে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সবারই সচেতন থাকা প্রয়োজন।'

এ কথা শুনে এক সন্তান প্রশ্ন করে বসল, 'কিন্তু বাবা, কেউ যদি আমাকে বলে, সে বেড়াতে গিয়েছে আর আমিও তার কথা বিশ্বাস করে আমার আরেক বন্ধুকে সেটা বললাম। কিন্তু পরে দেখা গেল, সে আসলে কোথাও বেড়াতে যায়নি, বাসাতেই ছিল। এক্ষেত্রে আমি কি তাহলে মিথ্যা বললাম?' বাবা বললেন, 'এটা মিথ্যা হবেনা।কারণ তুমি তা-ই বলেছ, যা তুমি বিশ্বাস করেছ। কিন্তু সে বেড়াতে যায়নি, মানে তুমি ভুল বলেছ অথবা তুমি যে মাধ্যম থেকে তথ্য পেয়েছ তা বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। তাই কোনো তথ্য পেলে সেটা আগে যাচাই করে নিতে হবে আমাদের।'

এরপর বাড়ির ছোট্ট ছেলেটি কিছু বলার জন্য হাত তুলে। সে প্রশ্ন করল, 'কিন্তু আমি সত্যিটা বললে মা আমাকে মারতে পারে। মার খেতে আমার মোটেও ভালো লাগে না। তাই কিছু হলে আমি মিথ্যা বলতে চাই। পরে কোনো এক সময় মাকে সত্যিটা জানিয়ে দেবো!' ছেলের কথা শুনে মা হেসে দিলো। তিনি বললেন, 'এবার তো আমি তোমার চালাকি ধরতে পেরেছি, এখন থেকে তোমাকে আর ছাড় দেবো না।'

এরপর বাবা বললেন, 'বাচ্চাদের কেউ যদি কোনো ভুল বা অপরাধ করে তবে তাদের বোঝানো উচিত। তাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া উচিত। তারা প্রতিজ্ঞা করবে, সেই ভুলটি তারা আর কখনো করবে না। যদি তারা ওই কাজ কখনো না করে, তবে তাদেরকে আর শাস্তিও দেওয়া হবে না।'

মা তখন প্রশ্ন করলেন, 'আর যদি তারা ওই কাজটি আবার করে?' বাবা বললেন, 'কাজটি আবার করলে, সত্য বলার পরও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু যদি সে মিথ্যা বলে, তবে তার শাস্তি দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

তখন এক সন্তান বলল, 'আমরা শাস্তি পেতে রাজি, কিন্তু মার খেতে রাজি নই।' তার কথায় সবাই হেসে উঠল। কিন্তু এই সমাধানে কেউ দ্বিমত করেনি। এভাবেই আলোচনার মাধ্যমে পরিবারটি বেশ কিছু সুন্দর সমাধানে একমত হলো।

সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে দৃঢ়তা

বর্তমানে আমরা এক দর-কষাকষির যুগে বাস করছি। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন করছে, যা আগে কেউ কখনো দেখেনি। মানুষ তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার কারণেই এমন অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। মানুষ আজ বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষার চূড়ায় থাকার কারণে নিজেদের মান-সম্মান, মর্যাদা নিয়ে আপস করতেও দ্বিধাবোধ করে না। কিছু মানুষ তো যেকোনো স্বার্থ রক্ষার্থে মান-সম্মান বিলিয়ে দিতেও রাজি থাকেন।

নিজের মান-সম্মানের ব্যাপারে দৃঢ় থাকা মানে কোনো ব্যাপারে শুধু অবিচল থাকাই নয়, বরং স্থিরতার সাথে টিকে থাকার যোগ্যতা অর্জন করাও এর অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ তাআলা এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নবিকে আদেশ দিয়েছেন-

সুতরাং আপনার প্রতি যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। অবশ্যই আপনি সরল পথে রয়েছেন [সুরা যুখরুফ, আয়াত:৪৩]

আমাদের শিশুদের এ সমস্ত মৌলিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত-

>আল্লাহ তাআলা সবকিছুর রিজিকদাতা। তিনিই সবকিছুর রক্ষাকর্তা।

>একজন মানুষের রিজিকসহ প্রতিটি বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর ওপর নির্ভর করছে।

> মহান আল্লাহ কাউকে যা দেননি তা দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। যা আল্লাহ তাআলা কারো জন্য বরাদ্দ রেখেছেন তা থামানোর শক্তিও কারো নেই।

> আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেউ যদি কোনো কিছু ত্যাগ করে, তবে প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাকে আরো ভালো কিছু দান করবেন।

আমাদের সন্তানদের যদি এসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে জানাতে পারি, তবে বড় হয়ে তারা ঘুষ নেওয়ার কথা চিন্তাও করবে না। এমন কোনো পথে এগুবে না যেখানে সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। বন্ধু ও সহকর্মীদের কাছে নিজেদেরকে হাসির পাত্রে পরিণত করবে না অথবা অধিক অর্থোপার্জনের জন্য নিজেকে হেয় করবে না। এই শিক্ষার কারণে তারা এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকবে, যা তাদের মানসম্মানকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দেবে। আমরা যদি আমাদের সন্তানদের এমন মৌলিক শিক্ষাগুলো না দিয়ে থাকি, তবে তারা দুর্নীতি ও খারাপ কাজের সাথে খুব সহজেই জড়িয়ে যাবে। সন্তানের এই ব্যর্থতা আসলে বাবা-মায়েরই ব্যর্থতা। সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে তারা ব্যর্থ বলেই গণ্য হবেন।

কোনো ব্যক্তি তার সম্মান, মূল্যবোধ ও মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করতে গিয়ে পার্থিব কিছু হারিয়ে ফেলাটা খুব স্বাভাবিক। এমনও হতে পারে, মহান আল্লাহ দীর্ঘমেয়াদে তার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই পৃথিবীতে সে নানারকম দুঃখ-কষ্ট ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এই পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে তার সম্মান ও মূল্যবোধ আরো শানিত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ না তার মূল্যবোধগুলো তার ভেতরে মজবুত ভিত্তি গড়ে তুলছে এবং সমাজে একটি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই যাবেন। যখন তিনি সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হবেন, তখন আরো বেশি কুরবানি করার প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যথায় এ বিষয়ে অবহেলা করলে ধীরে ধীরে তিনি তার সম্মান হারিয়ে ফেলবেন।

কীভাবে সম্মান রক্ষা করা যায় তার একটি উদাহরণ দেখা যাক-

এক ছেলে তার কাজের বিষয়ে বাবার কাছে অভিযোগ করে। যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সে কাজ করছে, তাদের সাথে চুক্তিপত্রে কিছু অস্পষ্টতা দেখা দিয়েছে। এ কারণে সংস্থাটি তার যাতায়াত খরচ নিয়ে ঝামেলা করছে। সব কথা শুনে বাবা বললেন, 'সব সমস্যা তুলে ধরে তুমি প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করছ না কেন?' ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো, 'বাবা, এই সামান্য বিষয়ে অভিযোগপত্র আমার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করবে।'

এ কথায় বাবা অনেক খুশি হলেন। ছেলের প্রশংসা করে বললেন, 'তোমার কাজে আমি আমার চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাচ্ছি। এমনকি তোমার কাজ আমার প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

অনেক সময় দেখা যায় যে, তরুণদের বেশ ভালো চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়। খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে তারা দেখে যে, এসব কাজ তাদের চরিত্র ও সম্মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। সব বিষয় বিবেচনায় এনে, নিজেদের মর্যাদা রক্ষার্থে তারা তুলনামূলক কম সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে নিচের বিষয়গুলো সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে-
> আমাদের সবার উচিত পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যধারণে উৎসাহ জোগানো। নিজেদের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য ধৈর্য থাকা আবশ্যক।

> কিছু বিষয় থাকে যার সাথে আপস করা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এসব বিষয়ে আপস না করার জন্য পরিবারের সবাইকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিয়ে যেতে হবে।

> মানুষ যেসব পাপ করে তার অধিকাংশই হয় পার্থিব বস্তুর প্রতি আকর্ষণ থেকে।একটি মুসলিম পরিবারের তাই বোঝা উচিত, জান্নাতের অফুরন্ত সুখ আর নিয়ামতরাজি পেতে হলে এই পৃথিবীর অনেক সুখসমৃদ্ধির লোভ এড়িয়ে চলতে হবে।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সুসম্পর্ক বজায় রাখার কৌশল

১. দুজনের জন্য সুবিধাজনক সময়টিকে কথা বলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। এমন যেন না হয়, একজন ব্যস্ত তো আরেকজন অবসর সময় কাটাচ্ছে। স্বামী স্ত্রীকে বলছে, 'তোমার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আছে। তুমি দয়া করে তোমার হাতের কাজগুলো রাখো।' অথবা স্ত্রী বলছে, 'আমি এখন তোমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। আমার মনে হয়, কথাগুলো তোমার বইপড়া থেকেও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'এভাবে জোর করে ডেকে এনে কথা বলাটা অনুচিত। কারণ, এতে করে দুজনেই বাধ্য হয়ে কথা বলতে আসেন। তারা আশা করতে থাকেন, হুট করে শুরু হওয়া আলাপটি হুট করেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের জীবনসাথিকে এভাবে বলি, 'কতদিন তোমার সাথে কফি খাওয়া হয় না! আমরা কি আজ একসাথে কফি খেতে পারি? এক ঘণ্টা পর কি ফ্রি থাকবে তুমি? তোমার সাথে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।'

ভুলে গেলে চলবে না, প্রতিটি সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার শ্রেষ্ঠ নিয়ম হলো, সবসময় অপর মানুষটিকে বুঝিয়ে রাজি করা। তাকে বাধ্য করে বৈঠকে বসানো কখনোই

ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বাধ্য করে কথা বলার চেয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়ায় অনুষ্ঠিত আলাপচারিতা বেশ ভালো ফল বয়ে আনে।

২. যখন কোনো দম্পতি কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে বসে কিংবা কোনো সমস্যার সমাধান করতে চায়, তখন যেন তারা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে কথা বলতে পারে, এটা লক্ষ রাখতে হবে। এমন যেন না হয়, যে আলোচনার জন্য এক ঘণ্টা প্রয়োজন তার জন্য আধ ঘণ্টা হাতে নিয়ে কথা বলা শুরু করলেন। সময়ের স্বল্পতা কথার মাঝে বারবার বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এরকম তড়িঘড়ি আলোচনা ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিকে ধাবিত করতে পারে। যা হয়তো পরবর্তীকালে পরস্পরের মধ্যকার দূরত্ব আরো বাড়িয়ে দেবে। অতএব আলাপ-আলোচনার জন্য উভয়ের পর্যাপ্ত পরিমাণ সময় এবং মাথা ঠান্ডা থাকা প্রয়োজন।

৩. সত্যি বলতে কী, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বেশ জটিল। এটা গভীর ও ঘনিষ্ঠ, স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ। আবার একইসাথে এটা ঠুনকো, জটিল, অগভীর এবং সংবেদনশীল। সম্পর্কের সফলতা নির্ভর করে অপ্রত্যাশিত ঘটনা সামাল দিতে পারার দক্ষতার ওপর। ঠিক এ কারণেই বিশেষ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন। সাধারণত এর জন্য খুব বুদ্ধিমান, চতুর বা জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের চেয়ে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির বেশি প্রয়োজন।স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক পৃথিবীর যেকোনো দুজন ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের তুলনায় বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত। তবু নিজেদের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়গুলোতে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ার চর্চা থাকাটা বাঞ্ছনীয়। যেমন ধরুন, একজন স্ত্রী চান না, তার স্বামী শ্বশুর-শাশুড়ির মনোমালিন্য নিয়ে কথা বলুক। একজন স্বামী হয়তো খাবার টেবিলে বসে ঘরোয়া আলাপ করতে পছন্দ করেন না। একজন সত্রী হয়তো কিছু কিছু খাবার খুবই অপছন্দ করেন। এই বিশেষতগুলোকে আমাদের সম্মান করা উচিত এবং এসবের সাথেই মানিয়ে চলা উচিত।

কথোপকথন একটি মানবিক সম্পর্ক যার মাধ্যমে একজন আরেকজনকে প্রভাবিত করে। এ কারণেই আশা করা যায়, কথোপকথন শুরুর আগে একজনের যে দৃষ্টিভঙ্গি বা অবস্থান ছিল, একটি সফল কথোপকথনের শেষে তার পরিবর্তন হবে। তবে একে কোনো ধরনের পরাজয় বা ব্যর্থতা বলে মনে করা যাবে না। ইমাম শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, 'আমাদের মতামতগুলো সঠিক। তবে তাতে ভুল থাকার আশঙ্কাও রয়েছে। আবার আমাদের বিপরীত মতামতটি ভুল যা কিনা ঠিক হলেও

হতে পারে।' তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমি যদি কারো সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে থাকি, তবে তা এই জন্য যে, আমার কিংবা আমার প্রতিপক্ষের মুখ থেকে আল্লাহ সত্যকে স্পষ্ট করে দেবেন।' [তাহযিরুল ফুজালা, পৃষ্ঠা:২৮]
কেউ তর্কে জিতে গেলে তার উচিত হবে কিছু সান্ত্বনাসূচক কথা বলে প্রতিপক্ষের কষ্টকে কিছুটা লাঘব করে দেওয়া। যেমন: 'এই কথাগুলো আমার চিন্তাতেও একবার এসেছিল।' অথবা 'আমিও একবার এটাই ভেবেছিলাম। কিন্তু পরে আমি আমার ভুলটা ধরতে পেরেছি।' ভুলে গেলে চলবে না, যেকোনো পরিস্থিতিতে আমাদের প্রধান লক্ষ্য থাকবে সম্পর্কটিকে যত্ন করে আগলে রাখা।

৪. যে ধরনের কথাবার্তায় স্বামী/স্ত্রী অপমানিত, বিব্রত বা অবহেলিত বোধ করে সেগুলো এড়িয়ে চলা সম্পর্ককে আগলে রাখার একটি অংশ।

কখনো আপনার স্ত্রীকে বলবেন না, 'আমি যদি তোমার জীবনে না আসতাম, তা হলে তোমাকে আইবুড়ো হয়ে বাপের বাড়িতে বসে থাকতে হতো।' অথবা আপনার স্বামীকে এমনটা বলবেন না, 'আমার বাবা-মা তোমার প্রতি দয়া দেখিয়ে তোমার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। নয়তো আমাকে স্ত্রী হিসেবে পেলে হাজারটা মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করত।'

কোনো স্বামীর উচিত নয় তার স্ত্রীকে এটা বলা, 'তোমার ছেলে তো বড় হয়ে তোমার ভাইয়ের মতো মাস্তান হবে।' কোনো নারীর উচিত নয় তার স্বামীকে বলা, 'তোমার মেয়েও তোমার বোনদের মতোই। পড়াশোনায় একেবারে গোল্লা!'

এই কথাগুলো দাম্পত্যজীবনের মধুর সম্পর্কটিকে ধ্বংস করে দেয়। যে আন্তরিকতা থাকা উচিত ছিল তার কেবল একটি ছায়া পড়ে থাকে। ভালো-খারাপ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই আছে। কেউ দোষত্রটির ঊর্ধ্বে নয়। খারাপটা বেশি দেখলে ফলাফল খারাপই আসে।

ভালোবাসার সাথে সমালোচনার মিশেল

পারিবারিক বন্ধন অটুট রেখে কীভাবে একে অন্যের সমালোচনা করা যায়, তা রপ্ত করাটা খুবই জরুরি। প্রায়ই বিভিন্ন বিষয়ে আমরা উত্তপ্ত আলোচনায় লিপ্ত হয়ে যাই। আমরা কী করি এবং কী করতে চাই, তার প্রতি একনিষ্ঠতা থেকেই পারিবারিক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারি। কারণ ভুলভ্রান্তি, অন্যায়, অসংগতি প্রতিটি পরিবারেই লক্ষ করা যায়। তবে কোনো পরিবারই চায় না, এই অসংগতিগুলো তাদের জীবনে বারবার ফিরে আসুক।সাধারণত কোনো জিনিসের অসংগতি সংশোধন করতেই সমালোচনা করা হয়। হতে পারে পরিবারেই একজন অন্যজনের জন্য এই সংশোধনকারী সমালোচনাগুলো করছে। পারিবারিক অসংগতি সংশোধনের লক্ষ্যে বাবা-মায়ের উচিত পারিবারিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রদানের জন্য সন্তানদের উৎসাহিত করা। পরিবারের যেসব বিষয়ে আলোচনা ও সংশোধন প্রয়োজন, সেসব বিষয়ে নির্দ্বিধায় আলোচনা করতে হবে। এভাবেই পরিবারে সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্যও একটি অনুমিত, সংশোধিত ও পরিশোধিত বিষয়ে আলোচনা করা শিখবে। পরিবার একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র। এখানে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দক্ষতা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ক্লাস ফোরে পড়া একটা বাচ্চা ছেলে একদিন তার মাকে বলল, 'মা, আমি আজ স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি ঘরের লাইট-ফ্যানগুলো জ্বলছে। সারাদিন কতটা অপচয় হয়েছে একবার চিন্তা করে দেখো!
এক কিশোরী মেয়ে তার বাবাকে বলছে, 'বাবা, আমরা বলতে গেলে কেউই ফজরের সালাত সময়মতো আদায় করি না। সাধারণত তুমি আমাদের না ডাকলে তো আমরা ঘুম থেকেই উঠতে চাই না।'

সেদিন বাড়ির ছোট ছেলেটি মাকে বলছিল, 'আম্মু, আমরা রাতে দেরি করে ঘুমাই বলে স্কুলে আমাদের ঘুম পায়। মাঝে মাঝে তো আমি আর ভাইয়া ক্লাসেই ঘুমিয়ে পড়ি।'

বাবা-মায়েরা যদি সন্তানদের পর্যবেক্ষণ করে সমালোচনা করার সুযোগ দেন, তবেই তারা পারিবারিক উন্নয়নমূলক মন্তব্য করতে উৎসাহ পাবে। বাচ্চারা যে শুধু পর্যবেক্ষণ করে তাদের মন্তব্য দেবে, ব্যাপারটা এমন নয়। বরং তাদের মন্তব্যগুলো যথার্থ পর্যবেক্ষণ ও আলোচনার মাধ্যমে উপযোগী করে তুলতে হবে।সবকিছু বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে পরিবারের একজন অপরজনের সমালোচনা ও সংশোধন করতে হবে। কারণ একদিকে যেমন পারিবারিক সম্পর্কগুলো দৃঢ় ও মজবুত হয়ে ওঠে, তেমনি অন্যদিকে এই সম্পর্কগুলো ভঙ্গুরও হয়ে যায়। একটিমাত্র আপত্তিকর শব্দ থেকেই স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রায়ই যদি এমন আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করা হয়, তবে পারিবারিক জীবন ও সম্পর্কগুলো খারাপ হতে থাকে। দিনদিন সম্পর্কগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হতে শুরু করে। তাই পরিবারের কেউ যদি কারো ভুলত্রুটি লক্ষ করে থাকে, তবে উপযুক্ত সময় ও আশেপাশের অবস্থা বিচার-বিবেচনা করে কথাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করুন। আরেকটা কথা, সমালোচনা হতে হবে বিনয়, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার সাথে।

যেমন: কোনো বাচ্চা যদি তার ভাইয়ের কোনো ভুল খেয়াল করে, তবে কথাটি কীভাবে ভাইকে জানানো যায়, সেই বিষয়ে সে তার মা-বাবার কাছে পরামর্শ চাইতে পারে। এমনও হতে পারে, মা-বাবা নিজেরাই তাদের ছেলের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন।আর যদি বাবা-মায়েদের কোনো ভুল লক্ষ করা যায়, তবে অবশ্যই সেই কথাটি বাড়ির বড়দের দিয়ে তাদেরকে জানাতে হবে। হতে পারে এক্ষেত্রে বাড়ির বড় সন্তান বাবা-মাকে এ ব্যাপারে সচেতন করছে অথবা মা-বাবা একে অপরকে এ বিষয়টি নিয়ে বলছেন। একজন সমালোচক অথবা পর্যবেক্ষক যতই সত্যবাদী অথবা নিরপেক্ষ হোক না কেন, তিনি যার বিষয়ে সমালোচনা করছেন তার সাথে সম্পর্ক কেমন সেদিকটা গুরুত্বের সাথে খেয়াল রাখবেন। কারণ, সমালোচনাকারী যদি এ বিষয়ে সচেতন না হন, তবে তার সংশোধনের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণই ব্যর্থ হতে পারে। এমনকি, কখনো কখনো এটি গঠনমূলক হওয়ার থেকে বেশি ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। আমাদের আশেপাশেই এমন অনেক ঘটনা দেখতে পারি, যেখানে মানুষ অবহেলার সাথে সংশোধনের চেষ্টা করে, ফলে সমস্যাটি অপরিবর্তনীয়ই থেকে যায় এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির আশঙ্কা তৈরি হয়।

আলাপচারিতা

আশ্চর্য হলেও সত্যি, দাম্পত্যজীবনে স্বাভাবিক কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা ও অবসরে টুকিটাকি গল্প করার জন্য আলাদা আলাদা সময় বের করাটা বেশ কঠিন।

বিষয়টা হলো, তারা একে অন্যের ঘনিষ্ঠতা, সাহচর্য, প্রশান্তি, নিরাপত্তা ও মমতার কেন্দ্রবিন্দু। এ কারণে নিজেদের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়াটা তাদের কাছে কঠিন ও অপছন্দের। অতএব আমরা বলতে পারি, স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনকে সার্থক করে তুলতে হলে তাদের অবসরকে কাজে লাগিয়ে একসাথে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আর এজন্য দুটি মৌলিক জিনিস থাকা চাই-

১. তারা যে বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে চাচ্ছেন সেটা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তার প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

২. কথোপকথনকে এমনভাবে গুছিয়ে নিতে হবে যেন তা অখণ্ড ও সমাধানকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে।

আলাপচারিতার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমি মনে করি, তাদের মধ্যকার যেকোনো সম্পর্কের লক্ষ্যই তাদের সংযোগকে ধরে রাখে। এই সম্পর্ক দুটি মস্তিষ্কের, দুটি আত্মার, দুটি হৃদয়ের, দুটি ভিন্ন পদমর্যাদার, দুটি চাহিদার, সার্বিকভাবে জীবন সম্পর্কে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির এবং একইসাথে পরিবারটির ভবিষ্যতের।

দম্পতির মধ্যকার সুন্দর সম্পর্ক একটি সুন্দর পারিবারিক পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করে। তারা ধীরে ধীরে একে অন্যের পছন্দ-অপছন্দকে আরো ভালোভাবে বুঝতে শেখে, যা পরবর্তীকালে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ একটি সাজানো-গোছানো পরিবার গঠনে সাহায্য করে।

এরকম পরিস্থিতিতে, অনেক সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই মিলিয়ে যায়। ছোটখাটো সমস্যাগুলোর সহজেই সমাধান বের করা যায়। আর বড় বড় সমস্যাগুলোর সাথে

নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। কিছু কিছু পরিবার আলাপ-আলোচনাকে গুরুত্বহীন মনে করে। তাদের জন্য এগুলো কেবলই পরিবারের কোনো সদস্যের অস্বাভাবিক আচরণ, কারো বিরুদ্ধে নালিশ-অভিযোগ এবং অপমান নিয়ে কথা বলার উপলক্ষ্য মাত্র। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তারা মাত্রাতিরিক্ত কথা বলার জন্য আফসোসও করে থাকে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত রাখার দায়ভার প্রাথমিকভাবে একজন স্বামীর ওপরই বর্তায়। স্ত্রীও চান তার স্বামী যেন তাকে ভালোভাবে বোঝেন, তার আবেগ-অনুভূতিকে গুরুত্ব দেন। স্ত্রীরা ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, তাদের পরম আকাঙ্ক্ষা, তাদের চাওয়া-পাওয়াগুলো যেন তাদের স্বামীরাই পূরণ করেন।

একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র ও বিশ্বাসভিত্তিক। একে অপরের ব্যক্তিগত কথা, দুর্বলতা, পারিবারিক বিষয় বা গোপন বিষয় অন্যের কাছে প্রকাশ করা ইসলামি আদবের পরিপন্থী। দাম্পত্য জীবনের শান্তি ও ভালোবাসা বজায় রাখতে গোপনীয়তা রক্ষা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।” [সূরা আল ইমরান, আয়াত:১৮৭]

এই আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের “পোশাক” বলা হয়েছে। পোশাক যেমন মানুষের দোষ-ত্রুটি ও গোপন বিষয় আড়াল করে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীরও উচিত একে অপরের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— “কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে তার স্ত্রীর কাছে যায় এবং স্ত্রী তার কাছে আসে, এরপর সে তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে।” [মুসলিম, হা/: ১৪৩৭]

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত বিষয় অন্যের কাছে বলা গুরুতর গুনাহ ও বিশ্বাসঘাতকতা।

গোপনীয়তা রক্ষার উপকারিতা—

>দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস বৃদ্ধি পায়
>ভালোবাসা ও সম্মান অটুট থাকে
>ঝগড়া-বিবাদ কমে যায়
>পরিবারে শান্তি বজায় থাকে
>আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আমানতের সম্পর্ক। তাই একজনের উচিত অন্যজনের দুর্বলতা, ব্যক্তিগত কথা ও গোপন বিষয় গোপন রাখা। এটাই ইসলামি শিক্ষা এবং সুখী দাম্পত্য জীবনের অন্যতম ভিত্তি।

সফল পরিবার গঠনের প্রচেষ্টা

মা-বাবা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন নিয়ে গড়ে ওঠে একটি পরিবার। আর এমন কিছু পরিবারের সমষ্টি হলো আমাদের সমাজ। ব্যক্তি-সাফল্যের চেয়ে পারিবারিক সাফল্য অনেক বেশি প্রয়োজন। আমাদের পরিবারে কিছু বিশিষ্ট ও সম্মানিত ব্যক্তি থাকতেই পারে। নিঃসন্দেহে এটি পরিবারের জন্য ভালো এবং সম্মানজনক। তবে সামগ্রিকভাবে পরিবারের সাফল্য অর্জনের জন্য সকল সদস্যের একে অপরের সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকা জরুরি। একটি সফল পরিবারের প্রভাব শুধু ওই পরিবারের সদস্যদের ওপরই পড়ে না। একটি পরিবারের সাফল্যের প্রভাব সমাজের ওপরও বিদ্যমান। ইসলামি সমাজের অধিকাংশ সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে এবং বিশ্বের অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের মধ্যে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে, সফল পরিবারগুলোর অবদান অনস্বীকার্য। অন্যান্য জাতির মধ্যে ইসলামের প্রাপ্য সম্মান নিশ্চিত করতে বিরাটসংখ্যক সফল ব্যক্তিত্ব ও সফল পরিবার আজ বড্ড প্রয়োজন। তাই সামগ্রিকভাবে সফল পরিবার অনেক বেশি দরকারি।
সাফল্য অর্জনের জন্য একটি পরিবারের কাছে আমরা বেশ কিছু প্রত্যাশা রাখি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় এবার জানা যাক—
একটি মুসলিম পরিবার ও ইসলামি শরিয়তের বিধান-দুটি একই সুতোয় গাঁথা। একটি অপরটির সাথে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনই পারে একটি পরিবারকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যেতে।

আসুন, এবার এমন একটা পরিবারের চিত্র দেখি, যে পরিবারটি ইসলামের সকল আবশ্যিক কাজগুলো খুব যত্নের সাথে করে থাকি। এই পরিবারের কোনো সদস্য সিগারেট বা মদ্যপানে আসক্ত নয়। সবার মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি সবসময়ই তার অনুজদের প্রতি সদয় থাকেন। আর তরুণ অনুজ সদস্যরা তাদের বড়দের সম্মান করে চলে। এদের সবাই সুশৃঙ্খল এবং শান্ত। পড়ালেখায় এরা বেশ আন্তরিক ও পরিশ্রমী। এরা জ্ঞানপিপাসু; জ্ঞানের জন্য রয়েছে অগাধ ভালোবাসা।
একবার ভাবুন তো, কেমন হতে পারে এই পরিবারটির অবস্থা?
পরিবারটির যেমন বর্ণনা দেওয়া হলো এবং এর সদস্যরা যে পথ অনুসরণ করছে, এতে তাদের সাফল্য নিশ্চিত। তারা যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার যথার্থ পথ বেছে নিয়েছে, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আল্লাহর আনুগত্য হলো সফলতা অর্জনের শ্রেষ্ঠ উপায়। অন্যদিকে অবাধ্যতার প্রতিটি মাধ্যম আমাদের ধ্বংস ও ব্যর্থতার পথে পরিচালিত করে। সফলতা ও ব্যর্থতার এই মাপকাঠি দিয়েই সবকিছু বিচার করা উচিত।

সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ না করা

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোন সময় মনোমালিন্য হ'তে পারে। এসব কোন কোন ক্ষেত্রে বাক-বিতণ্ডার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু ঝগড়া-ঝাটি ও বাক-বিতণ্ডা সন্তানদের সামনে করা বা তাদের সামনে অপ্রীতিকর কোন কিছু প্রকাশ করা উচিত নয়। এতে সন্তানদের মনে একটা বিরূপ প্রভাব পড়ে। যা তাদের কোমল হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। কোন কোন সময় সন্তানরা বিপাকে পড়ে যায়। যেমন কখনও পিতা বলে, তুমি তোমার মায়ের সাথে কথা বলবে না, আমার সাথে থাকবে। আবার মা বলে, তুমি তোমার পিতার সাথে কথা বলবে না, আমার কাছে থাকবে। আবার কখনও সন্তানরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কেউ পিতার পক্ষে, কেউ মায়ের পক্ষে যায়।
এতে পরিবারে অশান্তি নেমে আসে। কাজেই স্বামী-স্ত্রী উভয়ই সন্তানদের সামনে ঝগড়া-বিবাদ করা থেকে বিরত থাকবে এবং দু'জনের মাঝের অসন্তোষ ও রাগ-অভিমান সন্তানরা যাতে বুঝতে না পারে সে চেষ্টা করা তাদের জন্য অতীব জরুরী।

একটি ভালো পরিবেশের গুরুত্ব

আমাদের বসবাসের জন্য ভালো পরিবেশ বেছে নিতে হবে। একটি সভ্য পরিবেশে বসবাস মানেই বাকি সব পরিবেশের প্রতি আমাদের ঘৃণা প্রকাশ করা নয়। খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যে পরিবেশে বসবাস করছি, তা যেন অপরাধপ্রবণ না হয়। একটি দূষিত সমাজ হলো অপরাধ ও অনৈতিকতার কারখানা। মাদকাসক্তি এবং হতাশা থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এমন অনেক এলাকা আছে, যেখানে মানুষ সব ধরনের অনৈতিকতার সাথে বসবাস করছে। তারা নানান অপকর্মের সাথে জড়িত। কিছু এলাকার মানুষ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। প্রাথমিক চাহিদা পূরণ করাও তাদের জন্য কঠিন। কিছু কিছু এলাকায় আবার ভালো কোনো স্কুল নেই। বাচ্চাদের মেধাবিকাশ, চরিত্র ও স্বভাব গঠন এবং তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণে এর বিরূপ প্রভাব পড়ে। ঠিক এই কারণে সচেতন পরিবারগুলো জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে মফস্বল ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। অবশ্যই এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

আন্তরিকতার সাথে সকল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। অর্থাৎ, ছোটবড় সব বিষয়েই আমাদের নিবেদিত হতে হবে। মনোযোগের সাথে প্রতিটি বিষয়ই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করতে হবে।

এক বাবা জানতে পারলেন তার ছোট ছেলেটি রাস্তার খারাপ ছেলেদের সাথে মিশছে। এ কথা শুনে তিনি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'যাদের সাথে তুমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ, তারা কারা?' ছেলেটি বলল, 'ওদের কয়েকজন আমার এলাকার বন্ধু। আর বাকিরা আমার স্কুলের বন্ধু।' বন্ধুদের নাম ও পরিবার সম্পর্কে বাবা তার ছেলের কাছ থেকে জেনে নিলেন। এরপর তিনি সেই পরিবারগুলো সম্পর্কে মানুষের কাছ থেকে তথ্য জোগাড় করেন। বাবা নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করলেন-ছেলেগুলো আসলে কোন পরিবার থেকে এসেছে। সব রকম খোঁজ-খবর নেওয়া শেষ। এবার বাবা তার ছেলেকে জানিয়ে দিলেন, আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যেই সে যেন এই খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে। তাদের সাথে যেন সব মেলামেশা বন্ধ করে দেয়।

এদিকে অসৎসঙ্গের কারণে কী কী ভয়াবহ পরিণাম জীবনে আসতে পারে, ছেলেটির মা খুব সুন্দরভাবে সেটা বুঝিয়ে বললেন। ছেলেটি পুরো ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে

পেরে মা-বাবার কথা মেনে নিল। সন্তানের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে মা-বাবার ভূমিকা এমনটাই হওয়া উচিত।

এছাড়াও শিশুদের যেকোনো অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে শোনাটা খুব জরুরি। তাদের প্রতিটি বিষয় নিয়ে বাড়িতে আলোচনা করতে হবে। তারা কী কী সমস্যা ও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হচ্ছে, সে ব্যাপারে জানার চেষ্টা থাকা চাই। শিশুরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হবে, এটা খুব স্বাভাবিক। আর সব সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায়ও তাদের জানা নেই। অনেক সময় লজ্জায় বা ভয়ে তারা এসব সমস্যার কথা মা-বাবাকে বলতে পারে না। তাই সন্তানদের সম্পর্কে নিয়মিত খোঁজ রাখুন। সন্তান কোনো সমস্যা, দুশ্চিন্তা বা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে কি না, তার খোঁজ রাখা বাবা-মায়েদের অবশ্যকর্তব্য।

এই সমস্যাগুলো সামলানোর জন্য সময়ের সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রতি গুরুত্ব দিন। একটি আদর্শ পরিবার সময়ের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে। একজন কৃপণ ব্যক্তি টাকা অপচয় করছে এমন দৃশ্য যেমন বিরল, তেমনি একটি আদর্শ পরিবার সময়ের অপব্যবহার করবে এটাও অকল্পনীয়। সময়-ব্যবস্থাপনার (time management) মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার হাতের কাজটি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। খেলাধুলা, বিনোদন এবং ঘুমের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও তার হাতে থাকে। অগ্রাধিকার ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিটি কাজের জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ রেখে সময়-ব্যবস্থাপনা করতে হয়। এতে করে তুচ্ছ বিষয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ত্যাগ করতে হয় না।

যে পরিবার যত ভালোভাবে সময় পরিচালনা করতে পারে, সেই পরিবারের সদস্যরা একে অপরের কাছ থেকে সহযোগিতা ও সহায়তার মাধ্যমে ততটাই বেশি উপকৃত হয়। পরিবারের সবাই প্রতিটি সম্পর্ককে যথেষ্ট সময় দিতে পারে। এ কারণে তাদের মধ্যে অগাধ ভালোবাসা জন্মায়। দূরে গেলেও তাদের মধ্যে সুন্দর অনুভূতি বিরাজমান থাকে।

বর্তমানে একটি শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারকে আমরা একটি সফল পরিবার বলে গণ্য করি। যদিও আজকাল আর একেবারে অশিক্ষিত পরিবার খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে পরিবারের জন্য কেবল সাধারণ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়। বরং বিশেষ ও উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন। যে শিক্ষা কোনো সর্বজনীন শিক্ষার মানের সাথে অতুলনীয়। স্থানীয় কোনো মাপকাঠি দ্বারা এই শিক্ষার মূল্যায়ন করা হয় না।

প্রথমত, মা-বাবাকে খেয়াল রাখতে হবে যেন সন্তানের জ্ঞান অর্জনে সভ্যতা, অগ্রগতি ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটে।
দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে সন্তানদের মানসম্মত শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। মানসম্মত সঠিক শিক্ষা এখন বেশ ব্যয়বহুল হলেও তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত। নিম্নমানের শিক্ষা বর্তমানে ঝুঁকিপূর্ণ। ভবিষ্যতের জন্যও এমন শিক্ষা বিপজ্জনক।

সুতরাং পরিবারগুলো সন্তানদের জ্ঞানার্জনের অনুমতি দেবে। সন্তানের জ্ঞানার্জনের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এটা বলার কারণ হচ্ছে, এমন অনেক বাবা-মা আছেন, যারা জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সন্তানদের দূরে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেন না। তারা দুরাচার ও বিভ্রান্তির ভয়ে সন্তানদের এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে চান না। অনৈতিকতা ও পদস্খলনের ভয়ে সন্তানকে দূরে কোথাও যেতে না দেওয়াটা অবশ্যই শরিয়তসম্মত এবং গ্রহণযোগ্য (কারণ)। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উন্নত শিক্ষার জন্য দূরে যাওয়ার প্রয়োজন সত্যিই যদি হয়, তাহলে বাবা-মা সন্তানকে সেই অনুমতি দেবে। উন্নত ও সুষ্ঠু পরিবেশে সন্তান যেন জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এর ফলে শিশুটি উন্নত প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাবে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো বেশি উদ্ভাসিত হবে।
উন্নত পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের সুযোগ করে দেওয়া ছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সন্তানের প্রতিভা উদ্ভাবন করা। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব আগ্রহের একটি জায়গা আছে। এই আগ্রহের জায়গাতেই তার প্রতিভা লুকিয়ে থাকে। বাবা-মা যদি সন্তানের সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পায়, তাহলে তা বিকাশে সহায়তা করতে হবে। মহান আল্লাহর রহমতে বাবা-মায়ের এই সহায়তা আর অন্য কোনো সহায়তার সমতুল্য হবে না।
আনুমানিক ১৩ বছর বয়সে প্রতিটি শিশুর ঝোঁক থাকে প্রতিভা প্রদর্শনের প্রতি। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সে তার আগ্রহ প্রকাশ করে। অন্যান্য সব বিষয়ের তুলনায় শিশুটি নিজের আগ্রহের বিষয়ে বেশি মনোযোগী হয়। এ সময়ে সন্তানের মেধা-বিকাশে বাবা-মায়ের সহায়তা কাম্য। বর্তমানে কোন বিষয়ের প্রতি সন্তানের আগ্রহ আছে, সেটা অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় জিনিস নয়। বরং ভবিষ্যতে তার এই আগ্রহ কোন অবস্থানে গিয়ে ঠেকবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কথায় আছে, একজন অযোগ্য

ডাক্তারের থেকে একজন দক্ষ নার্স উত্তম। একইভাবে ১০ জন অদক্ষ প্রকৌশলী থেকে অবশ্যই একজন চৌকশ পরিদর্শক উত্তম।

কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহী সন্তান অবশ্যই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। সন্তানকে তার পছন্দের বিষয়ে প্রশিক্ষিত করার জন্য বাবা-মায়ের উচিত সব ধরনের সহায়তা করা।

বাবা-মায়ের উচিত সন্তানের জন্য ভালো শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। একজন ভালো শিক্ষক ভালো দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। বাবা তার সন্তানের আগ্রহের বিষয়ে দক্ষ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে পারেন। এতে সন্তান অনুপ্রাণিত হবে এবং তার আগ্রহ বাড়বে। প্রতিভা হলো সন্তানের ওপর মহান আল্লাহর অশেষ রহমত। এই প্রতিভার আবিষ্কার ও বিকাশ করতে সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা বাবা-মা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। কারণ, আজকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এসব বিষয়ে যত্নশীল হয় না।

পারস্পরিক সহযোগিতা

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শুধু দাম্পত্য বন্ধন নয়; বরং এটি পারস্পরিক ভালোবাসা, সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটি পবিত্র সম্পর্ক। আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের "পোশাক" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তারা পরস্পরের শান্তি, নিরাপত্তা ও সহযোগিতার মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেন— "তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।" [সূরা আল-বাকারা, আয়াত:১৮৭]

এই আয়াত দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী একে অপরের দোষ গোপন করবে, বিপদে পাশে থাকবে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

আরও বলেন— "আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম, আয়াত:২১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবারকে কাজে সহযোগিতা করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন— "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের কাজকর্মে সহযোগিতা করতেন; আর নামাজের সময় হলে নামাজে চলে যেতেন।" [সহীহ বুখারী, হা/৬৭৬]

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, সংসারের কাজ শুধু স্ত্রীর দায়িত্ব নয়; বরং স্বামীও সহযোগিতা করবে।

আরেক হাদিসে রাসূল ﷺ বলেন— "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" [সুনানে তিরমিযী, হা/৩৮৯৫]

পারস্পরিক সহযোগিতার কয়েকটি দিক—

>সুখে-দুঃখে একে অপরের পাশে থাকা

>সংসারের কাজ ভাগাভাগি করা

>আর্থিক ও মানসিক সহযোগিতা করা

>দ্বীনি কাজে একে অপরকে উৎসাহ দেওয়া

>ভুলত্রুটি ক্ষমা করা ও সুন্দর আচরণ করা

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও বরকত নিয়ে আসে। ইসলাম এমন একটি দাম্পত্য জীবন শিক্ষা দেয় যেখানে উভয়ে একে অপরের সহায়ক ও কল্যাণকামী হবে। তাই প্রত্যেক দম্পতির উচিত কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ আচরণ করা।

অধ্যায়-৬:সন্তান প্রতিপালন

ইসলামি ও নৈতিকতার শিক্ষা

সন্তান আল্লাহ তাআলার এক মহান আমানত। তাদেরকে সঠিকভাবে লালন-পালন করা, ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলা এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী বানানো পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই ঈমান, ইবাদত, সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, দয়া, সহানুভূতি, সততা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষা দিতে হবে। কারণ শিশুকালে যে শিক্ষা ও চরিত্র গঠিত হয়, তা সারাজীবন তার জীবনকে প্রভাবিত করে।

ইসলাম সন্তানদের শুধু পার্থিব শিক্ষায় নয়, বরং দ্বীনি ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পিতা-মাতার উত্তম আচরণ, সুন্দর আদর্শ ও সুশিক্ষাই সন্তানদের চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম মাধ্যম। পরিবারে ইসলামী পরিবেশ, কুরআন তিলাওয়াত, সালাত আদায় এবং ভালো কাজের চর্চা সন্তানদের নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।" [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত:৬]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার ওপর সন্তানের দ্বীনি শিক্ষা ও সঠিক পথনির্দেশনার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

আবার আল্লাহ তাআলা বলেন: "আর তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং এর ওপর অবিচল থাক।" [সূরা ত্বা-হা, আয়াত:১৩২]

সন্তানকে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, শিষ্টাচার, দয়া, ক্ষমা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ করার শিক্ষা দিতে হবে। এ বিষয়ে কুরআনে লুকমান (আ.)-এর উপদেশ অত্যন্ত শিক্ষণীয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "হে আমার প্রিয় বৎস! আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মহা জুলুম।" [সূরা লুকমান, আয়াত:১৩]

এছাড়া তিনি সন্তানকে নামাজ, সৎকাজের আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ এবং ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছিলেন । [সূরা লুকমান, আয়াত:১৭]

রাসূল ﷺ বলেছেন: "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।" [বুখারী হা/ ৮৯৩; মুসলিম হা/ ১৮২৯]
এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সন্তানদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে পিতা-মাতা আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করবেন।
রাসূল ﷺ আরও বলেছেন: "কোন পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্রের চেয়ে উত্তম কোনো উপহার দিতে পারে না।" [তিরমিজি হা/ ১৯৫২]
আরও বলেছেন: "তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও।" [আবু দাউদ হা/ ৪৯৫]
সন্তান প্রতিপালনে করণীয়
১. ছোটবেলা থেকেই তাওহীদ ও ঈমানের শিক্ষা দেওয়া।
২. কুরআন তিলাওয়াত ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা।
৩. নিয়মিত সালাত আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা।
৪. সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা ও শিষ্টাচারের শিক্ষা দেওয়া।
৫. সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও সহানুভূতিশীল আচরণ করা।
৬. ভালো বন্ধু ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৭. নিজের আমলের মাধ্যমে সন্তানের জন্য আদর্শ হওয়া।
সন্তান প্রতিপালন শুধু পার্থিব দায়িত্ব নয়; এটি একটি ইবাদতও বটে। ইসলামী ও নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য সম্পদে পরিণত হয়। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সন্তানদের চরিত্রবান, আদর্শবান ও আল্লাহভীরু মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। আল্লাহ তাআলা আমাদের সন্তানদের নেককার ও দ্বীনের খাদেম হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

যেসব বিষয়ে শিশুরা সক্রিয়

এ বিষয়টি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অনেক বাবা-মাই অভিযোগ করেন, তাদের সন্তান পড়ালেখায় অমনোযোগী। বারবার বলেও যখন কোনো কাজ হয় না তখন তাদের মনে হয় তারা বুঝি দেওয়ালের সাথে কথা বলছেন! তারা জানেন না যে, বাচ্চাকে

বারবার আদেশ করা তার জন্য ভালো নয়। বরং এখানে মূল সমস্যা হলো, বাবা-মায়ের সাথে সন্তানের সম্পর্ক ও মেলামেশায় অদৃশ্য দেওয়াল রয়েছে।
বাচ্চাদের প্রকৃতি যদি এমনই হতো যে, তারা প্রতিটি কথা শুনবে, তাহলে তো তাদের বড় করা পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজগুলোর একটি হতো। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বাচ্চারা খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখায়। বড়দের থেকে তারা কোনো অংশেই কম যায় না। নিজের মনমতো না হলে বড়রা যেমন সহজেই কারো কথা প্রথমে মেনে নিতে চায় না, ছোটদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারটি ঘটে।
আগের প্রজন্মের মানুষেরা এ বিষয়টি বেশ ভালোভাবেই বুঝতেন। এ কারণে দেখা যায়, আগের যুগের মাধ্যমিক শ্রেণি পাশ করেনি এমন মায়েরা এখনকার যুগের ডিগ্রিধারী মায়েদের তুলনায় সন্তান পালনে অনেক বেশি সফল ছিলেন। বাচ্চারা তাদের মায়ের শিক্ষা দেখে শেখে না, বরং তার ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ববোধ দেখে শেখে। চিন্তা করুন, কোনো মা তার বাচ্চাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করছেন, অথচ তিনি নিজেই বাচ্চার বাবা আর প্রতিবেশীদের সাথে মিথ্যা বলেন সবসময়! আবার ধরুন, কোনো বাবা তার ছেলেকে জামাআতে সালাত পড়া কিংবা টিভির সামনে কম বসার উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু তিনি নিজেই এসবের বিপরীত কাজ করছেন। এসব ক্ষেত্রে শিশুর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই আমরা কথার সাথে কাজের মিল রাখার ব্যাপারে বারবার জোর দিই।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পারিবারিক অবস্থা

পরিবার তার বর্তমান অবস্থার নানা দিক, যেমন-দৃঢ়তা, শান্তি, সফলতা ইত্যাদি সম্পর্কে অবশ্যই জানবে। প্রতিটি অবস্থাই আরো উন্নত করার সুযোগ থাকে।
এক্ষেত্রে যেসব ব্যাপারে আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত-
১. সন্তানকে কিছু শেখানোর ব্যাপারে বাবা-মা দুজনের মধ্যে সমঝোতা থাকা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে তাদের উচিত কোনো মতভেদ না করা; বরং একসাথে বসে ঠিক করে নেওয়া-সন্তানের মাঝে সঠিক আচরণ গড়ে তুলতে কে কোন ভূমিকা পালন করবে। এমনটা যেন না ঘটে, বাচ্চাই বাবা-মায়ের মাঝে মতভেদ উস্কে দিচ্ছে।

২. একটি পরিবার ও পরিবারের ছেলেমেয়েরা কি নিজেদের যথেষ্ট ধার্মিক মনে করে? করলে সেটা কতটুকু? এ প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করা প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সীমা হওয়া উচিত ফরজ দায়িত্বগুলো অবশ্যই পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো কোনোভাবেই না করা। এটা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাবা-মায়ের। যদি এতে তারা ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তবে এ থেকে উত্তরণের পথও তাদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে।

৩. পরিবারে স্বাস্থ্যকর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ বাবা-মাকেই নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য কিছু প্রশ্নের উত্তর ভেবে রাখা প্রয়োজন। পরিবারে বাচ্চারা কি নিজেকে নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসী মনে করে? পরিবারের সদস্যদের মাঝে কি পারস্পরিক ভালোবাসা ও বোঝাপড়া রয়েছে? বাবা-মা কি সন্তানদের তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করেন? তারা কি বিশ্বাস করেন জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ সঠিকভাবে লালন করার দক্ষতা তাদের রয়েছে?

বাবা-মায়ের উচিত পরিবারের পরিস্থিতি ও শিক্ষাগত চাহিদার ব্যাপারে নিজেদের মাঝে আলোচনা করা। পরিবারের সবকিছু ছন্নছাড়াভাবে চলছে এবং সেগুলো নিয়ে কোনো আলোচনাই হচ্ছে না-এমনটা যেন না হয়।

চার. প্রয়োজনে পরিবারের বন্ধনগুলো নতুন করে দৃঢ় করার উদ্যোগ নিতে হবে। সবার মাঝে আরো আন্তরিকতার আবহ তৈরি করতে হবে। এ পরিবর্তনে বাচ্চাদের প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা রাখার সুযোগ দিতে হবে। বাচ্চার জন্য আমাদের প্রতিটি কাজের প্রতিদান আমরা কেবল আল্লাহ তাআলার কাছে আশা করি-এই দৃষ্টিভঙ্গি বাচ্চাদের বোঝানো দরকার।

এক পরিবারের ঘটনা আমি জানি। বাবা বাচ্চাদের মনোভাব জানার জন্য লিখিতভাবে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন করতেন। এরপর প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে তাদের সাথে কয়েক দফায় আলোচনাও করতেন, পরিবারের পথচলায় আরো উন্নতি আনার ব্যাপারে। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের থেকে শুধু উত্তর গ্রহণ করেই তিনি ক্ষান্ত হতেন না; বরং সেগুলোর পেছনের কারণগুলোও তাদের কাছে জানতে চাইতেন। এতে করে তাদের মনের কথাগুলো পরিষ্কারভাবে বোঝা যেত। আবার বাচ্চারাও পুরো ব্যাপারটি গ্রহণ করত গুরুত্বের সাথে। সেই প্রশ্নগুলোর কিছু ছিল এরকম-

>একটি আদর্শ পরিবারের কী কী গুণ থাকা উচিত? এসবের কোনগুলো আমাদের পরিবারে নেই বলে তোমার মনে হয়?
>আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুদের পরিবারের তুলনায় কোন কোন দিক থেকে আমাদের পরিবার ভালো অবস্থানে আছে বলে তোমার মনে হয়?
> যখন তুমি বাইরে থাকো তখন কি বাসায় ফেরার ব্যাপারে উন্মুখ হয়ে থাকো?
>বাসায় থাকার সময় কোন বিষয়গুলো তোমাকে অনেক স্বস্তি দেয়?
>পরিবারে তোমার কোন অবদানগুলোর জন্য তুমি গর্ববোধ করো?
>পরিবারের কোন বিষয়গুলো বাইরের মানুষ জানলে তুমি লজ্জা পাবে?
>তোমার বাবা-মায়ের কোন আচরণগুলো তোমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে?
এভাবে বাবা তার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এই বোধটুকু আনতে পারবেন যে, তাদের পরিবার বর্তমান অবস্থার চেয়ে আরো উন্নত হতে চায়। এই প্রশ্নগুলো তাদের বর্তমান অবস্থার ত্রুটিগুলো নির্ণয়ে সহায়ক হবে। আর এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আমরা কেবল তখনই আমাদের উন্নতি করার পথগুলো খুঁজে পাব, যখন আমাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পারব।

সন্তানদের যেভাবে গড়ব

দুনিয়ায় বাবা-মা ছাড়া আর কোনো মানুষ চায় না কেউ তার থেকেও বেশি সফল হোক জীবনে। কেবল বাবা-মাই চান, তাদের সন্তান যেন তাদের চেয়েও বেশি ভালো হয়। তারা তো তাদেরই অংশ। কিন্তু শুধু চাইলেই তো আর সবকিছু হয় না। তাদের কোন পথে যাওয়া উচিত, কোন অবস্থায় থাকা উচিত, সে ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। এর ফলে সন্তানদের মাঝে শিক্ষা, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার বীজ বপন করে দেওয়া খুব সহজ।
সব বাবা-মাই তাদের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে ভালোটা চান। কিন্তু তাদের খুব কমই জানেন কীভাবে তা পাওয়া সম্ভব। এ বিষয়ে আমি কিছু পয়েন্ট তুলে ধরতে চাই-
১) অধিকাংশ বাবা-মায়ের স্বপ্ন, তাদের সন্তানেরা শারীরিক ও মানসিকভাবে ইসলামের শিক্ষায় বড় হয়ে উঠবে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসবে, উম্মাহর সম্পদ হিসেবে বেড়ে উঠবে। তারা আখিরাতে সফল হবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

করবে। তাকওয়া, ইবাদত ও সৎ আমলের প্রতি ভালোবাসা তাদের মাঝে গড়ে তুলতে হলে আগে আমাদের নিজেদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমানে মুক্তচিন্তার (লিবারেল) মতবাদ গোটা বিশ্বের উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও আকার বদলে দিচ্ছে। যদি এই ব্যাপারে আমরা এখনো সচেতন না হই, তবে আমাদের অজান্তেই আমরা আমাদের সন্তানদের হারিয়ে ফেলব।

২) তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা গড়ে তোলাটা খুব জরুরি। তাদের মাঝে বীরত্ব, উদারতা, মূল্যবোধ এবং বস্তুবাদী জীবনের ঊর্ধ্বে চিন্তা করার গুণ বিকশিত করতে হবে। তারা যেন জীবনে বড় কিছু অর্জন করতে পারে এবং অসৎ কামনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে, এমনটাই আমাদের লক্ষ্য থাকা উচিত।

এর অর্থ এই নয় যে, তারা মানুষের কাছে সম্মানিত হওয়াকে লক্ষ্য বানিয়ে ফেলবে। বরং তারা নিজেদেরকে এমন ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলবে যেন লোকেরা নিজে থেকেই তাদেরকে সম্মান করে।

আত্মমর্যাদা মানুষকে সুস্থভাবে চিন্তা করতে শেখায়। আত্মমর্যাদার অভাবে মানুষের মাঝে অনেক ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা তৈরি হয়। প্রচণ্ড চাপ কিংবা ব্যর্থতার কারণে মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই সম্মানের ভয়ে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকে সে। কিন্তু পরাজিত বা একাকিত্বে তিক্ত মানুষ কখনো কখনো বাবা-মা কিংবা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমনকি আইনবিরোধী কাজেও জড়িয়ে পড়ে।

কোনো সম্মানী ব্যক্তির সাথে আমরা যেভাবে আচরণ করি, সন্তানদের সাথেও তেমন আচরণ করা উচিত। এতে করে তাদের মাঝে আত্মমর্যাদা গড়ে উঠবে। একই সাথে লজ্জাজনক কাজের ব্যাপারেও তাদের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করে দিতে হবে।

৩) সন্তানদের মাঝে কিছু মৌলিক গুণাগুণ গড়ে তোলার চেষ্টা করা প্রয়োজন যেগুলো তাদের চমৎকার ব্যক্তিত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এরকমই কিছু গুণ সম্পর্কে আমরা এখন আলোচনা করব-

এক. মূল্যবোধ কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। বরং নিজেদের আচরণের মাধ্যমে তাদের মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হয়। অনেক সময় বড়দের আচরণে মুগ্ধ হয়ে বাচ্চারা মূল্যবোধ শেখে। আমি অনেক বাবা-মাকেই দেখেছি যারা সন্তানদের ভালোর জন্য কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু খুব দ্রুতই ফলাফল হিতে বিপরীত হয়েছে।

মূল্যবোধের পেছনে যে প্রজ্ঞা রয়েছে সেগুলোও আমাদের সন্তানদের শেখাতে হবে। সেই সাথে তাদের ভালো কাজের তাগাদা দেওয়া উচিত।
সন্তানদের মতো বয়সে আমরা নিজেরাই অনেক ভুল করেছি। তাই তারা ভুল করবে এটা মাথায় রেখেই তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করে যাওয়া উচিত। বাচ্চাদের সামনে আমাদের নিজেদের সেই ভুলগুলো স্বীকার করে নিয়ে অনুতাপ প্রকাশ করা উচিত। এতে করে তারা যেমন শিক্ষা লাভ করবে তেমনি তাদের সাথে আমাদের মানসিক ব্যবধানও কমে আসবে।

দুই. সন্তানদের মাঝে সত্যবাদিতার গুণটি গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা প্রয়োজন। শুরুতে বাচ্চারা যেসব মিথ্যা বলে সেগুলো তারা মনের খেয়ালে বলে মাত্র। তখন তাদের মিথ্যা বলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়। তাদের মধ্যে সত্যবাদিতার গুণটি গড়ে তোলার জন্য সততা ও অসততা সম্পর্কে তাদের কিছু প্রশ্ন করা যেতে পারে-
>কেন মিথ্যা বলা উচিত নয়?
>কেন স্কুলের পরীক্ষায় প্রতারণা করা অন্যায়?
>মিথ্যা বেশিক্ষণ টেকে না কেন?
>কেন সত্যবাদিতা কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়?
>মনে করো, তুমি সারা বছর কষ্ট করে টাকা জমিয়েছ, এরপর কেউ তোমার সাথে প্রতারণা করে সে টাকাগুলো নিয়ে গেল, তোমার তখন কেমন লাগবে?
>মনে করো, এমন একটি গোপন বিষয় আছে, যা তুমি কাউকে বলবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছ। কিন্তু কেউ একজন সেই গোপন বিষয়টা জানার জন্য তোমাকে প্রচুর টাকার লোভ দেখাল। তুমি তখন কী করবে?
শিশুরা কৈশোরে পা দিলে পুরো চিত্রটি বদলে যায়। অধিকাংশ কিশোর সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।
এক্ষেত্রে তার আচরণে যদি বুঝতে পারেন সে কোনো ঘটনা বানিয়ে বলছে, তাহলে অবশ্যই তার সামনে আপনার সন্দেহকে প্রকাশ করবেন। কারণ, এই বয়সে এসে শৈশবের সারল্য বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

তিন. নৈতিক সাহস আরেকটি প্রয়োজনীয় গুণ। এর অর্থ হলো সত্য বলা এবং তা কঠোরভাবে ধরে রাখা। এর আরো একটি অর্থ হলো চাপে পড়ে অন্যায় কাজ না করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা। যেকোনো সমস্যা দৃঢ় চিত্তে মোকাবেলা করা উচিত এবং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা উচিত, তিনি সব সমস্যা দূর করে দেবেন। এই মহৎ গুণটি বাচ্চাদের মাঝে গড়ে তুলতে তাদেরকে সালাফদের জীবনের ঘটে যাওয়া বিভিন্ন গল্প ও ঘটনা বারবার শোনাতে হবে। পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন কিছু ঘটনা বলেও তাদের উৎসাহ দিতে পারি।

সন্তান যদি আপনার ব্যাপারে কোনো সমালোচনা করে তবে সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। তার সমালোচনার পদ্ধতিতে কোনো ত্রুটি থাকলে সেটা তাকে বুঝিয়ে বলুন। তার মাঝে সৎ সাহস জাগিয়ে তুলুন এবং তাকে বোঝান, যেকোনো বড় অর্জনের জন্য সাহস প্রয়োজন। আবার ছোটখাটো ব্যাপারে বেশি খুঁতখুঁতে স্বভাব ব্যর্থতা ডেকে আনে।

চার. দাতব্য কাজ ও অন্যদের সাহায্য করা অনেক প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয় গুণ। আমাদের বাচ্চাদের মাঝে এই অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে তাদের ভেতর থেকে ঔদ্ধত্য, স্বার্থপরতা, মন্দ চিন্তা, একাকিত্ব-এরকম দোষগুলো দূর করা সম্ভব। দুঃখের বিষয়, এসব দোষ বর্তমান যুগের মানুষগুলোর মাঝে প্রবলভাবে বিদ্যমান। আমাদের সন্তানদের বোঝানো উচিত, জীবন শুধু একার নয়; বরং অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করার মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। মানুষের মধ্যে তারাই শ্রেষ্ঠ, যারা অন্যদের সাহায্যে এগিয়ে আসে, পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করে এবং মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল। সন্তানদের শেখানো উচিত, তারা যেন প্রতিবেশী বাচ্চাদের সাথে নিজের খেলনা শেয়ার করে, খেলাধুলার সময় অন্যদের সাথে মিলেমিশে খেলে এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ায়।

অনেক পরিবারে দেখা যায় দান করার জন্য একটি নির্দিষ্ট বাক্স থাকে এবং পরিবারের সবাই সেখানে টাকা জমা করে। কয়েক মাস পরপর বাক্সটি খোলা হয় এবং দুস্থ-বঞ্চিত মানুষদের মাঝে সেসব অর্থ বিলিয়ে দেওয়া হয়। এটি একটি ভালো অভ্যাস।

বাচ্চাদেরকে কাজ ও উপার্জনের ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া দরকার। সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি সম্পদ সঠিকভাবে তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক উপার্জন করা এবং খরচ করার দায়িত্ব আমাদের দিয়েছেন। জীবনের জন্য সম্পদ

অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের অভাবে অনেকে অনেক সমস্যায় পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে সব সমস্যার সমাধান সম্পদ দিয়ে হয় না।

যার সম্পদ নেই সে অবশ্যই দরিদ্র। তবে তার থেকেও দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যার কাছে সম্পদ ছাড়া কিছুই নেই। সততা, তাকওয়া, জ্ঞান ইত্যাদি সুন্দর গুণগুলো যার নেই সে-ই তো সবচেয়ে বেশি দরিদ্র।

কঠোর পরিশ্রমের সাথে সম্পদ উপার্জনের সম্পর্ক বাচ্চারা সহজে বুঝতে পারে না। এজন্যই এ সম্পর্কে তাদের বোঝানো প্রয়োজন।

সম্পদ অর্জন করা এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমা রাখার ব্যাপারে বাচ্চাদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। তবে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে কিংবা কোনো ভালো কাজের প্রশংসা হিসেবে বাচ্চাদের টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত নয়। এতে সম্পদ তাদের কাছে ভালোবাসা ও মূল্যায়নের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারা যেন সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।

এ পর্যন্ত আমরা যেসব বিষয় আলোচনা করলাম সেগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে বাচ্চাদের পরিষ্কারভাবে বোঝানো প্রয়োজন। তবে যতটুকু আলোচনা করলাম তা অনেকাংশেই যথেষ্ট বলা যায়। এক্ষেত্রে আমাদের অক্ষমতার ব্যাপারে আমরা আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই।

মনের যত কথা

বাচ্চারা বিভিন্ন জিনিস দেখে ভয় পায়। এমন সময়ে বাবা-মায়ের মমতা পেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

মমতা দেখানোর বিভিন্ন উপায় রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকরী হলো বাচ্চার সাথে মনের অনুভূতি শেয়ার করা। এজন্য প্রথমে অনুভূতিগুলো বোঝা প্রয়োজন। বাচ্চারা এমন জিনিসে আনন্দ লাভ করে যেসবে বড়রা খুব কমই মনোযোগ দিয়ে থাকে। তেমনিভাবে বাচ্চারা এমন অনেক কিছুতে বিরক্তি অনুভব করে যেগুলোতে বড়রা বিরক্ত হয় না। তাই বাচ্চাদের অনুভূতিগুলো বোঝা প্রয়োজন।

ধরুন, কোনো বাচ্চা সস্তা একটা খেলনা হারিয়ে ফেলে কাঁদছে। হয়তো সে এটা হারানোর জন্য শাস্তি পাওয়ার ভয়ে কাঁদছে, অথবা সে হয়তো ভাবছে এটার মতো

আর কিছু পাবে না। বাবা-মায়ের উচিত তার চিন্তা ও অনুভূতিকে বোঝার চেষ্টা করা। হতে পারে তার এসব চিন্তা যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক। কিন্তু তারপরও তার অনুভূতিগুলোকে গুরুত্বের সাথে নিয়ে তার সাথে কথা বলা প্রয়োজন।

কিংবা ধরুন, কোনো বাচ্চা পরীক্ষার রেজাল্ট পেয়েছে। এই পরীক্ষায় সে কোনোমতে পাস করেছে, যদিও পুরো পরীক্ষার সময়টা সে ভেবেছিল সে অবশ্যই প্রথম তিনজনের একজন হবে। এখন সে তার রেজাল্ট নিয়ে অনেক বেশি হতাশ।

এরকম পরিস্থিতিতে বাচ্চাকে বকা দেওয়া অনুচিত। বরং তাকে বলা উচিত, 'আমরা জানি, তুমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছ। তুমি যেমনটা ভেবেছিলে তার চেয়ে পরীক্ষা অনেক বেশি কঠিন ছিল। তাই মন খারাপ কোরো না। ইনশা আল্লাহ পরের বার তুমি আরো ভালো করবে।'

বাচ্চার কষ্টের সময় তার সাথে মমতাপূর্ণ আচরণ করা এবং তার কষ্টের ভাগীদার হওয়া উচিত। এতে করে আমরা তার সাথে আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারব। এতে যথাযথ শিক্ষা প্রদান ও সন্তান-প্রতিপালনে আমাদের সক্ষমতা বাড়বে। অনেক তরুণ-তরুণী থেকে আমরা প্রায়ই এমন অভিযোগ পাই, তারা তাদের পরিবার থেকে যথেষ্ট যত্ন ও মানসিক সাপোর্ট পায় না।

উৎসাহ প্রদান

কোনো শিশুকে তার ভালোবাসার কাজে উৎসাহ দিলে সে এই বিষয়টিকে তার প্রতি যত্ন হিসেবে গ্রহণ করে। সে বুঝতে পারে, আমরা তার ইচ্ছাকে মূল্যায়ন করছি। পাশাপাশি বাচ্চাকে কোনো কাজে উৎসাহ দেওয়ার কারণে সে বুঝতে পারে, তার সামর্থ্যের ওপর আমাদের বিশ্বাস আছে। তার প্রতি আমাদের এই ভরসা তার আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

বাস্তবতা হলো, কোনো জাতির মহাপুরুষদের সংখ্যা নির্ভর করে এই উৎসাহের ওপর। কোনো জাতির আধুনিকতা ও অগ্রগতির এটি একটি মাপকাঠি। কোনো জাতি যত উন্নত হয়, তারা তত বেশি মেধাবীদের মূল্যায়ন করে এবং তাদের উৎসাহ দিয়ে শক্তি যোগায়। এর উল্টোটাও একইভাবে সত্য। অনুন্নত জাতির মানুষগুলোর মাঝে

কোনো কাজে উৎসাহ দেওয়ার প্রবণতা কাজ করে না। ফলে তাদের মধ্যে মহৎ মানুষ গড়ে ওঠে না।
উৎসাহ ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি আলোচনা করব-
> গবেষণায় দেখা যায়, বাচ্চাদের কোনো অর্জন উপলক্ষ্যে সাথে সাথে কোনো পুরস্কার দিলে তারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। এতে করে সে অবচেতনভাবে ভালো কাজের সাথে পুরস্কারের সম্পর্ককে মনের মধ্যে গেঁথে নেয়। এভাবে সে ভালো কাজে উৎসাহ পায় এবং একসময় এটা তার চরিত্রের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। অপরদিকে পুরস্কার দিতে দেরি করলে এটা তার মাঝে অবচেতনভাবে উপলব্ধি তৈরি করে যে, সে যা অর্জন করেছে সেটার কোনো মূল্য তার বাবা-মায়ের কাছে নেই। আর বয়সে প্রবীণ হোক বা যুবকই হোক-সবাই তাদের পরিশ্রমের ফল দ্রুত পেতে চায়। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রমিকদের পারিশ্রমিক যথাসময়ে আদায়ের ব্যাপারে বলেছেন-
শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও। [সহিহুল জামি আস-সাগির, খন্ড: ১; পৃষ্ঠা: ২৪০]

> গবেষণায় আরো দেখা যায়, বাচ্চাদের ওপর বস্তুগত পুরস্কারের চেয়ে স্নেহপূর্ণ পুরস্কার বেশি প্রভাব ফেলে, মনে সন্তুষ্টি ও সুখের অনুভূতি তৈরি করে। এটা কেবল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং সব বয়সের মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
এতে সুবিধা হলো এ ধরনের পুরস্কারে কোনো ধরনের অর্থ ব্যয় করতে হয় না। ফলে এ ধরনের পুরস্কার যত খাশ দেওয়া যায়। এতে করে সন্তান যেমন অনেক বেশি উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করে, তেমনি বাবা-মাও মানসিক প্রশান্তি লাভ করেন। মমতাপূর্ণ পুরস্কার হতে পারে হাসি, চুমু, জড়িয়ে ধরা, পিঠে কিংবা মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এমনকি বাবা-মা সন্তানকে আরো যত্ন করে, তার কথা শোনার মাধ্যমে কিংবা প্রশংসা করে তাকে পুরস্কৃত করতে পারেন।
আবার বস্তুগত পুরস্কারের মধ্যে হতে পারে তাকে কিছু টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা যেন সে মনমতো কিছু কিনতে পারে, হতে পারে তাকে কিছু চকলেট দেওয়া, প্রতিবেশীর বাচ্চাদের সাথে ফুটবল খেলতে দেওয়া, খেলাধুলা করা কিংবা কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

একজন শিক্ষাবিদ বলতেন, 'আপনারা সন্তানদের অনেক বেশি ভালোবাসা দিন এবং কম টাকাপয়সা দিন। কারণ, তাদের ভালোবাসার চাহিদাটাই সবচেয়ে বেশি। কম টাকাপয়সা দিয়েও তারা মানিয়ে নিতে পারে। ধনী পরিবারে সম্পূর্ণ বিপরীত কাজটি করা হয়। তারা সন্তানদের পেছনে অগণিত অর্থসম্পদ ব্যয় করে, কিন্তু সরাসরি খুবই কম তাদের প্রতি মমতা দেখায়।

> সন্তানের ভুল আচরণগুলো শুধরানোর জন্য একই সাথে মমতাময় ও বস্তুগত পুরস্কার দিয়ে তাকে সংশোধন করা যায়। যেমন: কোনো বাচ্চা হয়তো তার হোমওয়ার্ক ফেলে রাখে এবং প্রায়ই এ ব্যাপারে হেলাফেলা করে। তখন তার মা তাকে বলতে পারেন, 'তুমি যদি প্রতিদিন রাত আটটার মধ্যে তোমার হোমওয়ার্ক শেষ করতে পারো, তাহলে তোমাকে আমি এই-এই জিনিস উপহার দেবো।' হয়তো কোনো বাচ্চা তার ছোট ভাইকে জ্বালাতন করে। তখন তার মা তাকে বলতে পারেন, 'তুমি যদি তার সাথে আর কখনো এমনটা না করো, তাহলে আমি তোমাকে পার্কে ঘুরতে নিয়ে যাব।' এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বাচ্চার যে বদভ্যাসটি আমরা পরিবর্তন করতে চাই তা বাচ্চাকে সুনির্দিষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। একই সাথে আমরা তাকে যে পুরস্কারের ওয়াদা করব তা অবশ্যই পালন করতে হবে। নতুবা সে আমাদের কাছ থেকে ভলশিক্ষা পাবে এবং তার কাছে আর আমাদের কথার কোনো গুরুত্ব থাকবে না।

> কোনো কাজ করার আদেশ করলে অনেক সময় বাচ্চা নিজেই আমাদের কাছে পুরস্কার চেয়ে বসে। যেমন: 'আমি এই-এই কাজ করব, যদি তোমরা আমাকে এই জিনিসটা দাও' কিংবা 'আমি আমার ঘর পরিষ্কার করব, যদি ভাইয়া তার ঘর পরিষ্কার করে।'
এসব ক্ষেত্রে সন্তানকে কোনো ধরনের পুরস্কার দেওয়ার ওয়াদা করা উচিত নয়। বরং তাকে তার দায়িত্ব পালনে আদেশ দিতে হবে। নইলে তার দায়িত্ববোধের অনুভূতি দুর্বল হয়ে যাবে।

> বাচ্চারা যেন পুরস্কার ও উৎসাহকে অপব্যবহার করতে না পারে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। হয়তো কোনো বাচ্চা তার তিন ভাইবোনকে ছেড়ে তার বাবার সাথে

ঘুমানোর জেদ করছে। এক্ষেত্রে মা হয়তো তাকে চকোলেট দিয়ে আলাদা ঘুমানোর জন্য চেষ্টা করতে পারেন। এতে করে হবে কী, সে তার এই কাজের মাধ্যমে পুরস্কারের অপব্যবহার করার পথ চিনে ফেলবে। ফলে সে বারবার একই জিদ ধরবে।

কাজের প্রতিফলন

বাচ্চারা যা করবে সেটার প্রতিফলও তাদের ভোগ করতে হবে, এটা তাদের মাথায় থাকতে হবে। এক মায়ের কথা জানি। একবার তিনি তার বাচ্চাদের দুপুরে খাওয়ার জন্য ডাক দিলেন। সাথে এও বলে দিলেন, দুপুরের খাবার শেষে রাতের খাবারের আগপর্যন্ত অন্য কোনো খাবার দেওয়া হবে না। কিন্তু বাচ্চাদের একজন বন্ধুর সাথে টেলিফোনে কথা বলায় এতই ব্যস্ত ছিল যে, কথা শেষে ফিরে এসে দেখল টেবিলে কিছুই নেই। ফ্রিজ খুলে দেখল সেখানেও কিছু নেই। এরপর রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর সে খাবার পেল। এই ঘটনার বহু বছর পর ছেলেটা স্মৃতিচারণ করে বলেছিল, 'সেদিন আমি বড় একটা শিক্ষা পেয়েছিলাম। এরপর আর কখনোই খাবার টেবিলে আসতে দেরি করিনি।'

নার্সারি পড়ুয়া এক বাচ্চার ঘটনা। স্কুলে যেতে তার একদমই ভালো লাগত না। একদিন সে তার স্কুলড্রেস না পরে বসে রইল যেন বাবা তাকে স্কুলে নিয়ে যেতে না পারেন। তার বাবা একটা ব্যাগে স্কুলড্রেসটা নিলেন, তারপর বাচ্চাটা যে কাপড় পরে ছিল সে অবস্থাতেই তাকে গাড়িতে ওঠালেন। স্কুলে পৌঁছে বাচ্চাটার স্কুলড্রেস পরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকল না। এভাবে তার প্রতিদিনের স্কুলে যাওয়ার সমাধান হয়ে গেল।

শিশুদের আঘাত না করা

ইসলামে শিশুদের প্রতি দয়া, স্নেহ ও কোমল আচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিশুদের শারীরিক বা মানসিকভাবে আঘাত করা তাদের স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে এবং তাদের মনে ভয় ও কষ্টের জন্ম দেয়। তাই অভিভাবক, শিক্ষক ও সমাজের সকলের উচিত শিশুদের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে আচরণ করা। ভুল করলে তাদেরকে মারধর না করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। শিশুদের প্রতি সদাচরণ করলে তারা আত্মবিশ্বাসী, নৈতিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর।” — [সূরা আল-মায়িদাহ ৫:২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন।

অধ্যায়-৭:পারিবারিক সমস্যা ও সমাধান

ঝগড়া-বিবাদ সমাধান

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতভেদ বা ঝগড়া হওয়া মানবিক বিষয়। তবে ইসলাম শান্তি, ধৈর্য ও পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতে শিক্ষা দেয়। সংসারের শান্তি রক্ষায় উভয়ের উচিত ক্ষমাশীল হওয়া, সুন্দর ভাষায় কথা বলা এবং একে অপরের অধিকার আদায় করা।

১. ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করা

রাগের সময় ধৈর্য ধারণ করলে বড় ধরনের বিরোধও সহজে মিটে যায়। আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।

“আর ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।” [সূরা আল-আনফাল: ৪৬]

২. সুন্দর ভাষায় কথা বলা

কঠোর কথা ঝগড়া বাড়ায়, আর নম্র কথা সম্পর্ক মজবুত করে।

“মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বল।” [সূরা আল-বাকারা: ৮৩]

৩. একে অপরকে ক্ষমা করা

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ক্ষমাশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

“তোমরা ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর ও মার্জনা কর।” [সূরা আত-তাগাবুন: ১৪]

৪. পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান-

সমস্যা হলে রাগ না করে আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।

“তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।” [সূরা আশ-শূরা: ৩৮]

৫. উভয় পরিবারের সালিশ গ্রহণ

যদি সমস্যা বড় হয়ে যায়, তাহলে উভয় পরিবারের ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিদের মাধ্যমে মীমাংসা করা উচিত।

“তোমরা স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত কর।” [সূরা আন-নিসা: ৩৫]

৬. একে অপরের ভালো দিক দেখার চেষ্টা করা-

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে দোষের পাশাপাশি গুণগুলোকেও গুরুত্ব দিতে হবে।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
“কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে; তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য একটি স্বভাব পছন্দ হবে।” [সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৯]
স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ধৈর্য, ভালোবাসা, ক্ষমা ও ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলার মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আল্লাহভীতি থাকলে সংসারে শান্তি ও বরকত প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভুল বোঝাবুঝি দূর করা

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালোবাসা, বিশ্বাস ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক সময় ছোট বিষয় থেকেও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ইসলাম এসব সমস্যা দূর করার জন্য সুন্দর আচরণ, সত্যবাদিতা ও ধৈর্যের শিক্ষা দিয়েছে।
১. খোলামেলা ও সুন্দরভাবে কথা বলা:
ভুল বুঝাবুঝি দূর করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো শান্তভাবে নিজেদের কথা প্রকাশ করা।
“আর মানুষের সাথে উত্তমভাবে কথা বল।” [সূরা আল-বাকারা: ৮৩]
২. সন্দেহ ও কুধারণা পরিহার করা:
অকারণে সন্দেহ দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে।
“হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা ও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাক; নিশ্চয় কিছু সন্দেহ পাপ।” [সূরা আল-হুজুরাত: ১২]
৩. ক্ষমা ও সহনশীলতা অবলম্বন করা:
মানুষ ভুল করতেই পারে। তাই ক্ষমা করলে সম্পর্ক আরও মজবুত হয়।
“তোমরা ক্ষমা কর, উপেক্ষা কর ও মার্জনা কর।” [সূরা আত-তাগাবুন: ১৪]
৪. একে অপরের ভালো দিকগুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া:
শুধু দোষ না দেখে গুণগুলোকেও মূল্যায়ন করা উচিত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে; তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য একটি স্বভাব পছন্দ হবে।" [সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪৬৯]

৫. রাগের সময় তর্ক না করা:

রাগের মুহূর্তে কথা বাড়ালে ভুল বুঝাবুঝি আরও বৃদ্ধি পায়। তাই শান্ত হওয়ার পর আলোচনা করা উত্তম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— "শক্তিশালী সে নয় যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" [সহিহ বুখারি, হা/ ৬১১৪]

৬. পারস্পরিক বিশ্বাস বজায় রাখা:

বিশ্বাস দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি। সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা ভুল বুঝাবুঝি দূর করে।

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন আমানত তার হকদারের কাছে পৌঁছে দিতে।" [সূরা আন-নিসা: ৫৮]

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভুল বুঝাবুঝি দূর করতে ধৈর্য, আন্তরিক আলোচনা, ক্ষমাশীলতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস অত্যন্ত জরুরি। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী চললে দাম্পত্য জীবনে শান্তি, ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধৈর্য ও ক্ষমার গুরুত্ব

সংসার জীবন সুখী ও শান্তিময় করার জন্য ধৈর্য (সবর) ও ক্ষমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুণ। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখতে এই দুটি গুণ অপরিহার্য। ধৈর্য মানুষের রাগ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ক্ষমা পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

সংসারে নানা ধরনের সমস্যা, মতবিরোধ ও কষ্ট আসতেই পারে। এসব পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করলে পরিবারে শান্তি বজায় থাকে। অল্পতেই রাগান্বিত বা উত্তেজিত হলে ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন— "নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৩]

আরও বলেন— "আর ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।" [সূরা হূদ: ১১৫]

স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত একে অপরের ভুল-ত্রুটি ধৈর্যের সাথে মেনে নেওয়া। কারণ মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। ধৈর্য পরিবারে স্থায়িত্ব ও মানসিক প্রশান্তি আনে।

ক্ষমা মানুষের হৃদয়কে কোমল করে এবং সম্পর্ককে মজবুত করে। সংসারে ছোটখাটো ভুল নিয়ে কঠোর আচরণ করলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্ষমাশীলতা ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন— "তারা যেন ক্ষমা করে এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন?" [সূরা আন-নূর: ২২]

রাসূল ﷺ বলেন— "দান সদকা সম্পদ কমায় না, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।" [সহীহ মুসলিম, হা/২৫৮৮]

ক্ষমা করলে পারিবারিক সম্পর্ক গভীর হয় এবং শয়তানের প্ররোচনায় সৃষ্টি হওয়া বিভেদ দূর হয়। একজন ক্ষমাশীল ব্যক্তি পরিবারের সকলের কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। ধৈর্য মানুষকে রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে, আর ক্ষমা সেই রাগের ফলাফলকে সুন্দরভাবে শেষ করে। এ দুটি গুণ একত্রে থাকলে সংসারে ভালোবাসা, দয়া ও পারস্পরিক সম্মান বৃদ্ধি পায়।

সংসার জীবনে সুখ, শান্তি ও স্থায়ী ভালোবাসা অর্জনের জন্য ধৈর্য ও ক্ষমার বিকল্প নেই। ইসলাম মানুষকে ধৈর্যশীল ও ক্ষমাশীল হতে শিক্ষা দিয়েছে। তাই প্রতিটি মুসলিম পরিবারের উচিত পারস্পরিক আচরণে ধৈর্য ধারণ করা এবং একে অপরকে ক্ষমা করার মানসিকতা গড়ে তোলা।

তালাকের বিষয় (সংক্ষিপ্ত আলোচনা)

ইসলামে পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা, দয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পরিবার টিকে থাকে। তবে কখনো কখনো পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ, ঝগড়া-বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। ইসলাম এসব সমস্যার সমাধানের জন্য ধৈর্য, আলোচনা ও সালিশের নির্দেশ দিয়েছে। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে শেষ উপায় হিসেবে তালাকের বিধান রাখা হয়েছে।

তালাকের পরিচয়

“তালাক” শব্দের অর্থ বন্ধনমুক্ত করা বা ছেড়ে দেওয়া। ইসলামী শরীয়তে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করাকে তালাক বলা হয়। ইসলাম তালাককে বৈধ করলেও এটি অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ।

রাসূল ﷺ বলেন– “হালাল বিষয়সমূহের মধ্যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক।” [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস: 2178]

পারিবারিক সমস্যার কারণ:

পারিবারিক জীবনে বিভিন্ন কারণে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যেমনঃ

>পারস্পরিক অবিশ্বাস

>রাগ ও অসহিষ্ণুতা

>আর্থিক সংকট

>দাম্পত্য অধিকার আদায়ে অবহেলা

>পরস্পরের গোপনীয়তা প্রকাশ

>তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ

>ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে থাকা

এসব কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং কখনো তা তালাক পর্যন্ত গড়ায়।

ইসলাম যে সমাধান দিয়েছে-

১. ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা:

স্বামী-স্ত্রীকে ধৈর্য ধারণ ও পরস্পরকে ক্ষমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন– “তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।” [সূরা আন-নিসা : ১৯]

২. পারস্পরিক আলোচনা:

সমস্যা হলে রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত না নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করার চেষ্টা করতে হবে।

৩. সালিশ ব্যবস্থা:

ইসলাম পারিবারিক বিরোধে উভয় পরিবারের পক্ষ থেকে সালিশ নিযুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে।

আল্লাহ বলেন– “তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তবে একজন সালিশ পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন সালিশ নারীর পরিবার থেকে নিযুক্ত কর।” [সূরা আন-নিসা : ৩৫]

৪. আলাদা অবস্থান ও সময় দেওয়া:

কখনো কিছু সময় দূরে থাকলে রাগ কমে যায় এবং সম্পর্ক পুনরায় স্বাভাবিক হতে পারে।

তালাক কখন গ্রহণযোগ্য

যখন সব ধরনের সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং সংসার টিকিয়ে রাখা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায়, তখন ইসলাম তালাকের অনুমতি দিয়েছে। তবে তা হতে হবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে।

তালাকের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা-

>রাগের মাথায় তালাক না দেওয়া

>স্ত্রীকে পবিত্র অবস্থায় এক তালাক দেওয়া

>ইদ্দত পর্যন্ত পুনর্মিলনের সুযোগ রাখা

>স্ত্রীকে কষ্ট না দেওয়া

>সন্তানের অধিকার রক্ষা করা

আল্লাহ তাআলা বলেন– “তালাক দু’বার। এরপর হয় সুন্দরভাবে রাখা, না হয় সদয়ভাবে বিদায় দেওয়া।” [সূরা আল-বাকারা : ২২৯]

আরও বলেন– “তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখো না।” [সূরা আল-বাকারা : ২৩১]

তালাকের ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ-

>সন্তানদের মানসিক কষ্ট

>পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হওয়া

>সামাজিক অস্থিরতা

>আর্থিক ও মানসিক সংকট

>আত্মীয়তার সম্পর্ক দুর্বল হওয়া

তাই ইসলাম তালাককে শেষ উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বলেছে।

ইসলাম পরিবারকে রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। পারিবারিক সমস্যা দেখা দিলে ধৈর্য, ক্ষমা, আলোচনা ও সালিশের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

তালাক বৈধ হলেও তা যেন হঠকারী সিদ্ধান্তে না হয়। বরং সব ধরনের সমাধানের পথ বন্ধ হয়ে গেলে শরীয়তের নির্দেশনা অনুযায়ী তালাক কার্যকর করা উচিত। এতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ শান্তিপূর্ণ থাকবে।

অধ্যায় ৮: আদর্শ মুসলিম পরিবার

নবীজির (ﷺ) পারিবারিক জীবন

মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর পারিবারিক জীবন ছিল ভালোবাসা, দয়া, ন্যায়বিচার, সহযোগিতা, ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম চরিত্রের অনন্য দৃষ্টান্ত। একটি আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের জন্য নবীজি ﷺ-এর পারিবারিক জীবন অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১. পরিবারে ভালোবাসা ও দয়ার আচরণ:

নবীজি ﷺ পরিবারের সদস্যদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। তিনি স্ত্রী, সন্তান ও নাতি-নাতনিদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন এবং তাদের সঙ্গে কোমল আচরণ করতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" [সূরা আল-আহযাব আয়াত:২১]

হাদিসে এসেছে: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।" [তিরমিযী, হা/ ৩৮৯৫]

২. স্ত্রীদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের সম্মান করতেন, তাদের মতামত গ্রহণ করতেন এবং তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতেন।

হাদিসে এসেছে: "তোমরা নারীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ কর।" [বুখারী, হা/ ৫১৮৫] হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারে পারস্পরিক পরামর্শের গুরুত্ব শিক্ষা দিয়েছেন।

৩. পরিবারের কাজে সহযোগিতা:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। তিনি কখনো পারিবারিক কাজকে ছোট মনে করতেন না।

হাদিসে রয়েছে: আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। আর যখন নামাজের সময় হতো, তখন নামাজের জন্য বের হয়ে যেতেন।" [বুখারী, হা) ৬৭৬]

এ থেকে বোঝা যায় যে পারিবারিক দায়িত্ব শুধু একজনের নয়; বরং সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।

৪. সন্তানদের প্রতি স্নেহ ও উত্তম শিক্ষা:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুদের ভালোবাসতেন এবং তাদের সঙ্গে মমতাপূর্ণ আচরণ করতেন।

হাদিসে রয়েছে: আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে শিশুদের প্রতি অধিক দয়ালু কাউকে দেখিনি।" [মুসলিম, হা/ ২৩১৬]

তিনি সন্তানদের দ্বীনি শিক্ষা, নৈতিকতা ও উত্তম চরিত্র গঠনের প্রতি গুরুত্ব দিতেন।

৫. ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য রক্ষা:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সকল সদস্যের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতেন। তিনি কখনো পক্ষপাতিত্ব করতেন না।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচার ও সদাচরণের নির্দেশ দেন।" [সূরা আন-নাহল আয়াত:৯০]

পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায়পরায়ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৬. ক্ষমা ও ধৈর্যের শিক্ষা:

পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ও ক্ষমার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" [সূরা আলে ইমরান আয়াত:১৩৪]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো প্রতিশোধপরায়ণ ছিলেন না; বরং ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করতেন।

৭. পারিবারিক শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারকে ইবাদত ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত করতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি তোমার পরিবারকে সালাতের নির্দেশ দাও এবং এর উপর অবিচল থাক।" [সূরা ত্ব-হা আয়াত:১৩২]

তিনি রাতের তাহাজ্জুদ, কুরআন তিলাওয়াত এবং আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে পরিবারে ঈমানি পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

৮. পরিবারে পারস্পরিক সম্মান:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সদস্যদের সম্মান করতেন এবং কাউকে অপমান করতেন না।

হাদিসে বর্ণিত আছে: "মুমিনদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম। আর তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম।" [তিরমিযী, হা/ ১১৬২]

নবীজি ﷺ-এর পারিবারিক জীবন ছিল আদর্শ মুসলিম পরিবারের পূর্ণাঙ্গ নমুনা। তিনি পরিবারে ভালোবাসা, দয়া, ন্যায়বিচার, পারস্পরিক সহযোগিতা, ধৈর্য, ক্ষমা, সম্মান এবং দ্বীনি শিক্ষার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজকের মুসলিম সমাজ যদি তাঁর পারিবারিক আদর্শ অনুসরণ করে, তবে পরিবারে শান্তি, সুখ, সৌহার্দ্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব হবে। তাই আদর্শ মুসলিম পরিবার গঠনের জন্য নবীজি ﷺ-এর পারিবারিক জীবনকে অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

সাহাবীদের পরিবার

ইসলামে পরিবার হলো সমাজের মূল ভিত্তি। একটি আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর পাশাপাশি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পারিবারিক জীবনও মুসলিমদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁরা ঈমান, তাকওয়া, পারস্পরিক ভালোবাসা, সন্তান প্রতিপালন, ত্যাগ ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে এমন পরিবার গড়ে তুলেছিলেন যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

সাহাবিদের পরিবারের বৈশিষ্ট্য-

১. ঈমান ও তাকওয়াভিত্তিক পরিবার:

সাহাবিদের পরিবারের মূল ভিত্তি ছিল আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান। তাঁদের ঘরে কুরআন তিলাওয়াত, ইবাদত, যিকির এবং আল্লাহর বিধান পালনের পরিবেশ ছিল।

আল্লাহ তাআলা বলেন— “হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত :৬]

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এই আয়াতের বাস্তব প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদের দ্বীনের শিক্ষা দিতেন এবং আল্লাহর আনুগত্যে অভ্যস্ত করতেন।

২. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা:

সাহাবিদের পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিল সম্মান, ভালোবাসা ও সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ বলেন— "তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।" [সূরা আর-রূম, আয়াত:২১]

উদাহরণ: আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পরিবার

আবু বকর (রা.)-এর পরিবার ইসলামের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাঁর কন্যা আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পিতার জন্য খাদ্য পৌঁছে দিতেন। পুরো পরিবার ইসলামের সেবায় নিবেদিত ছিল।

৩. সন্তানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা:

সাহাবিরা সন্তানদের শুধু দুনিয়াবি শিক্ষা নয়, বরং ঈমান, চরিত্র ও ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন— "হে আমার সন্তান! আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না।" [সূরা লুকমান, আয়াত:১৩]

উদাহরণ: উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর পরিবার

উমর (রা.) তাঁর পরিবারকে নিয়মিত দ্বীনের শিক্ষা দিতেন। তাঁর সন্তান আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদিস বর্ণনাকারী হিসেবে পরিচিত হন। এটি সঠিক পারিবারিক শিক্ষার ফল।

৪. দানশীলতা ও ত্যাগের শিক্ষা:

সাহাবিদের পরিবারে দান, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ ছিল সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

উদাহরণ: উসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর পরিবার

উসমান (রা.) তাঁর সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন। তাঁর পরিবারও এই মহান গুণে গড়ে উঠেছিল। তাঁরা দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকে বেশি গুরুত্ব দিতেন।

আল্লাহ বলেন— “তোমরা কখনো পূর্ণ নেকি অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু আল্লাহর পথে ব্যয় করো।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত:৯২]

৫. পর্দা, লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতা:

সাহাবিদের পরিবারে ইসলামী শালীনতা অত্যন্ত গুরুত্ব পেত।

উদাহরণ: আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) ও ফাতিমা (রা.)-এর পরিবার

তাঁদের পরিবার ছিল সরলতা, লজ্জাশীলতা, ধৈর্য ও আল্লাহভীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অভাব থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কখনো অভিযোগ করতেন না; বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রাখতেন।

৬. পারিবারিক সমস্যায় ধৈর্য ও ক্ষমা:

সাহাবিদের পরিবারে মতভেদ হলেও তারা ধৈর্য, ক্ষমা ও উত্তম আচরণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন— “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।” [তিরমিযি, হা/ ৩৮৯৫]

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এই হাদিসের বাস্তব নমুনা ছিলেন।

৭. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া:

সাহাবিদের পরিবার দুনিয়াবি স্বার্থের চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিত।

আল্লাহ তাআলা বলেন— “হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা বানিয়ে দিন এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানান।” [সূরা আল-ফুরকান, আয়াত:৭৪]

তাঁদের পরিবারের প্রতিটি সদস্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন পরিচালনা করতেন।

বর্তমান যুগে আমাদের করণীয়

সাহাবিদের পরিবারের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের উচিত—

১. পরিবারে কুরআন ও সুন্নাহর চর্চা করা।

২. সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া।

৩. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রাখা।

৪. পর্দা ও শালীনতা রক্ষা করা।

৫. ধৈর্য, ক্ষমা ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তোলা।

৬. পরিবারের সবাইকে নামাজ ও ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করা।
৭. আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পারিবারিক জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো।
সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর পরিবারগুলো ছিল ইসলামী আদর্শের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁদের ঘরে ঈমান ছিল ভিত্তি, কুরআন ছিল পথনির্দেশক, সুন্নাহ ছিল জীবনব্যবস্থা এবং আখিরাত ছিল চূড়ান্ত লক্ষ্য। আজ মুসলিম সমাজে শান্তি, সৌহার্দ্য ও নৈতিকতা ফিরিয়ে আনতে হলে সাহাবিদের পারিবারিক জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করলেই একটি সুখী, শান্তিপূর্ণ ও আল্লাহভীরু পরিবার গঠন সম্ভব হবে।

বর্তমান যুগের শিক্ষা

নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর পারিবারিক জীবন ছিল মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। বর্তমান যুগে পারিবারিক অশান্তি, সম্পর্কের অবনতি, সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয় এবং পারস্পরিক দূরত্বের প্রেক্ষাপটে তাঁদের জীবন থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।
১. পরিবারে ভালোবাসা ও সম্মান প্রতিষ্ঠা করা:
বর্তমান যুগে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভালোবাসা ও পারস্পরিক সম্মান কমে যাচ্ছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করতেন। সাহাবিরাও পরিবারে সম্মান ও মর্যাদার পরিবেশ বজায় রাখতেন।
করণীয়:
>পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সম্মান করতে হবে।
>রূঢ়তা ও অপমানজনক আচরণ পরিহার করতে হবে।
>ভালোবাসা প্রকাশে কার্পণ্য করা যাবে না।
২. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা:
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহকর্মে স্ত্রীদের সহযোগিতা করতেন। বর্তমান যুগে সংসারকে শুধু একজনের দায়িত্ব মনে না করে উভয়ের সহযোগিতায় পরিচালনা করা জরুরি।

করণীয়:

>সংসারের কাজ ভাগাভাগি করে করতে হবে।

>একে অপরের কষ্ট ও পরিশ্রমকে মূল্যায়ন করতে হবে।

>পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

৩. ধৈর্য ও সহনশীলতা চর্চা:

পারিবারিক জীবনে মতবিরোধ হওয়া স্বাভাবিক। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবিগণ ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতেন।

করণীয়:

>সামান্য কারণে সম্পর্ক নষ্ট করা যাবে না।

>রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

>সমস্যা হলে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে।

৪. সন্তানদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান:

সাহাবিগণ সন্তানদের ঈমান, নামাজ, সততা ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা দিতেন। বর্তমান যুগে প্রযুক্তির অপব্যবহার ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে এ শিক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

করণীয়:

>সন্তানদের ইসলামী মূল্যবোধ শেখাতে হবে।

>নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দিতে হবে।

>সন্তানদের জন্য আদর্শ হতে হবে।

৫. পরিবারের জন্য সময় দেওয়া:

বর্তমান যুগে কর্মব্যস্ততা ও প্রযুক্তিনির্ভর জীবনের কারণে পরিবারের সদস্যরা একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারকে সময় দিতেন এবং তাঁদের খোঁজখবর নিতেন।

করণীয়:

>পরিবারের সঙ্গে নিয়মিত সময় কাটাতে হবে।

>একসঙ্গে খাবার খাওয়া ও আলোচনা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

>মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে হবে।

৬. ক্ষমাশীলতা ও ভুলত্রুটি উপেক্ষা করা:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সদস্যদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করতেন এবং কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতা অবলম্বন করতেন।

করণীয়:

>ছোটখাটো ভুল নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি করা উচিত নয়।

>ক্ষমা ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

>সম্পর্ক রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. গোপনীয়তা রক্ষা করা:

সাহাবিগণ পারিবারিক বিষয় জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন না। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পারিবারিক সমস্যা প্রকাশ করার প্রবণতা দেখা যায়।

করণীয়:

>স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিষয় গোপন রাখতে হবে।

>পারিবারিক দুর্বলতা অন্যের কাছে প্রকাশ করা উচিত নয়।

>পরিবারের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে।

৮. ন্যায়বিচার ও ভারসাম্য বজায় রাখা:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারের সকল সদস্যের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতেন।

করণীয়:

>সন্তানদের মধ্যে বৈষম্য করা যাবে না।

>পরিবারের সকলের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

>সিদ্ধান্ত গ্রহণে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে।

৯. আল্লাহভীতি ও ইবাদতকেন্দ্রিক পরিবার গঠন:

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের পরিবার ছিল আল্লাহভীতি ও ইবাদতের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

করণীয়:

>পরিবারে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

>আল্লাহর সন্তুষ্টিকে পারিবারিক জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে হবে।

>ধর্মীয় মূল্যবোধকে পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ করতে হবে।

বর্তমান যুগে আদর্শ পরিবার গঠনের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিদের পারিবারিক জীবন থেকে আমরা শিখি—ভালোবাসা, সম্মান, সহযোগিতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা, সন্তানদের সুশিক্ষা, গোপনীয়তা রক্ষা, ন্যায়বিচার এবং আল্লাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এসব শিক্ষা বাস্তবায়ন করতে

পারলে পরিবারে শান্তি, সুখ ও বরকত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ!!!